কথা নয় কবিতা

* * * *

মহুয়া

* * * *

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ :: কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬০

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা ৬

মূল্য দু' টাকা চার আনা

উৎসর্গ

শুধু পা-দুটোকে নির্ভর ক'রে মাটির বুকে হেঁটে-বেড়ান শেখবার জন্যে মানুষের জীবনে শৈশবই যথেষ্ট। কিন্তু তার পরেও মানুষকে আরও অনেক পথে হাঁটতে হয়, যখন হয়তো পা-দুটো কোন কাজে লাগে না—তখন একমাত্র প্রয়োজন হয় মন। সেই মনোজগতে সুস্থভাবে চলতে যাঁরা আমায় প্রথম সাহায্য করেন, তাঁদের ঋণ শোধ করা আমার সাধ্যের বাইরে;—এমন কি তার চেষ্টাও হয়তো একটা অপরাধ। কিন্তু তবু বিরাটের কাছে মাথা নত ক'রতে বারে বারে মন চায়। তাই যত অযোগ্যই হোক, আমার ভক্তির অর্ঘ্য হিসাবে এ ফুল তাঁরা গ্রহণ করবেনই—এই বিশ্বাসেই এ বই উৎসর্গ ক'রলুম সেই কর্ম্মযোগী পুরুষদ্বয়ের উদ্দেশে :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীকমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

—ইতি

চিরপ্রণত

মহুয়া

ভূমিকা

ছেলেবেলা থেকে বাবাকে ভয় ক'রে আসছি, আজও করি। এখনও সিনেমা দেখতে যাওয়ার আগে অকারণ ভয়ে বুক কাঁপে। কিন্তু আমার বাবার আর একটা দিকের পরিচয় আমার বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে, সে হ'লো তাঁর পুত্রের জন্যে একটা সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনার উদার দৃষ্টিভঙ্গির দিক। ভয়ের পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বাবার মনে যে স্নেহের নদী লুকোনো আছে তার পরিচয় আমি জীবনে একাধিকবার পেয়েছি, কিন্তু সে কথা স্মরণ ক'রে প্রণাম জানাতেও আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কারণ, পিতৃদেব আমার চেয়ে অনেক দূরে, অনেক উঁচু আসনে সমাসীন; আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাঁকে প্রণাম জানানোও দুঃসাধ্য। তাঁর একান্ত স্নেহ না হ'লে আমার এ-বই অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

বই সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য নেই। যা বলবার সবই আমার নায়ক তুহিনই বলেছে; কারণ, সে নিজে একটু বেশী কথা বলতে ভালবাসে। তাই কথার বাহুল্যের জন্যে পাঠক আমায় দোষী না ক'রে তুহিনকেই ক'রবেন। তাছাড়া এ বইয়ের কোন চরিত্রই একেবারে কাল্পনিক নয়; অর্থাৎ, ট্রামে-বাসে এদের সঙ্গে পাঠকের যে-কোনদিন দেখা হ'তে পারে। সুতরাং ওদের সম্বন্ধে যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তবে তা আমাকে না জানিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ওদের বললেই বাধিত হব।

ছাপার কাজে যাঁরা আমায় একান্তভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আমি সবচেয়ে কৃতজ্ঞ—তাঁরা আমায় ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ দিয়ে আমার লেখাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রতে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করেছেন। আমার বিগত স্কুলজীবনের হেডমাষ্টার মশাই শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও আমি সমধিক ঋণী।

ইতি—

'চৌধুরী পার্ক', ভবানীপুর। "মহুয়া"

মহালয়া, ১৩৬০

খোলা চিঠি

(গোপী-তাতু-পবি ও নি. লে. বি.-কে)

অনেক গোপনতার আজ হ'লো প্রকাশ। কলেজ স্কোয়্যারের ধার দিয়ে তোদের সঙ্গে যেতে যেতে কত স্বপ্ন দেখেছি, নির্ম্মলের হোষ্টেলে ব'সে কতদিন আনমনা হ'য়ে উল্টোপাল্টা কথা বলেছি—তোরা কত প্রশ্ন করেছিস কিন্তু উত্তর না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিস; আমিও উত্তর দিতে না পেরে দুঃখিত হয়েছি তার চেয়ে বেশী। আজ আর প্রকাশে কোন বাধা নেই—চারিদিকের দোপাটি-রঙিন শরতের আলোর মতই আজ আমি অনাবৃত। এতকাল আমার একান্ত আপনার পাঠক ছিলি তোরাই—আজ পাঠক হয়তো কিছু বাড়ল, কিন্তু তারা কবে যে আপন হবে জানিনে। নির্ম্মলের হোষ্টেলে আমাদের ছোট্ট সাহিত্যিক আড্ডাটির স্মৃতি ঘুমের মত জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রইল। ঘরের ভেতরটা কতদিন ভ'রে গেছে কবিতার ভিড়ে, জানলার বাইরে লাল পাঁচিলের গায়ে ছোট অশথচারার বুকে নেমেছে বৃষ্টির ফোঁটা—সে কখন মাথা দুলিয়েছে শরতের আলোর বন্যায়, কখন ধূসর শীতের বেলাশেষের গানে উঠেছে কেঁপে। সেদিকে চেয়ে নির্ম্মলকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হ'তো: টেবিলের ওপর অগোছাল স্তূপীকৃত বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে টুথ্‌ব্রাস, টুথ্‌পেষ্ট ছড়ান—জলের গেলাস, পেন্‌সিল, ব্লেড্, কালির সিসি, সবকিছু উঁকি দিচ্ছে চারিদিক থেকে। ছেলেরা হয়তো পূজোর ছুটিতে হোষ্টেল

ফাঁকা ক'রে চ'লে গেছে দেশে—রয়ে গেছে নির্ম্মল। বিরাট হোষ্টেলের শূন্য বারান্দায় ছায়ারা নীরবে কেঁদেছে—শূন্যতা-ভরা হোষ্টেল জীবনের একটা ম্লান ছবিতে শরতের রমণীয় সন্ধ্যাকেও ধূসর-শ্রান্ত লেগেছে। সেদিন একমাত্র সান্ত্বনা ছিল আমাদের সাহিত্যিক আসরটা। আজ প্রায় সবাই আমরা কিছু কিছু দূরে, তবু ইচ্ছে করে তেমনি আড্ডা জমিয়ে বসতে। যত তাড়া-তাড়ি পারিস একটা দিন স্থির কর্, অনেক কথা আছে বলবার; পরি-কল্পনা আছে আরও কিছু গড়বার যার স্বপ্ন আমি একাই নয়, তোরাও একদিন দেখেছিলি—"সেই কাদামাটির স্বপ্ন"। ইতি—

তোদের

মহুয়া

এক

নীলিম মেঘের টুকরোর মাঝে এরোপ্লেনের রূপোলি পাখাটা বারে বারে হারিয়ে যাচ্ছিল—সেটা ভেসে চলেছে বিশ্বকবির "শেষের কবিতা"র দেশে। তুহিন বসে আছে ছোট্ট কাঁচের জানলাটার পাশে। বাইরে রাশি রাশি মেঘের ঢেউ—কত বর্ণের সমারোহ—একটা পাখীর রাজত্ব! নীচে গাছপালা, পাহাড়-নদী সবকিছু মিলিয়ে একটা রিলিফ্ ম্যাপের মত মনে হচ্ছে। তারই মাঝে মাঝে খালি দেশলাইয়ের খোলের মত মানুষের ঘর। এত উঁচু থেকে মানুষ চোখে পড়ে না। মনে হয়, কোন আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের ভয়ে পিঁপড়ের মত মানুষগুলো মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে কোন পাতালপুরীর গর্ত্তে।

তুহিন বাইরের থেকে চোখ দুটো ভেতরে ফিরিয়ে আনে।—কত রকমের যাত্রীতে প্লেনটা ভর্ত্তি! ঐ যে মিষ্টার মিত্র, একটু আগে যিনি তুহিনের কাছে খবরের কাগজটা নেওয়ার সময় বেশ খানিক আলাপ ক'রে নিলেন, তিনি এখন নিসর্গ সন্দর্শনে মগ্ন। কোলের ওপর খবরের কাগজটা ভাঁজ করা—মাঝে মাঝে স্ত্রীর ঠেলা খাচ্ছেন। তুহিন বেশ বুঝতে পারছে, জানলার দিকে বসবার জন্যে তাঁর স্ত্রীর ব্যগ্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চারিদিকে চেয়ে সেই ভদ্রমহিলা খুব তাড়াতাড়ি একবার ক'রে স্বামীকে ঠেলা মারছেন আর পরক্ষণেই কেউ দেখে ফেললো

কিনা দেখবার জন্যে চকিত দৃষ্টিটা চারিদিকে বুলিয়ে নিচ্ছেন। এই সময়টায় মিঃ মিত্র যেন একটু বেশী রকম কবি বা দার্শনিক ভাবাপন্ন হ'য়ে যাচ্ছেন—স্ত্রীর পার্থিব খোঁচার বহু উর্দ্ধে তাঁর মন যেন কোন অদৃশ্য-লোকে চলে গেছে (যদিও কোনদিনই জাহাজের মাল সাপ্লাই ছাড়া সংসারের কথাও চিন্তা করার মত তাঁর অবসর নেই—কাব্য তো দূরের কথা)। ওদিকে এক ভদ্রলোকের অবস্থা বড় ভয়াবহ। 'বায়ুর গর্ত্তে' পড়ার সময় অল্প একটু ঝাঁকুনিতে ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যাচ্ছে; তবু স্ত্রীর কাছে নিজের গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে চুপ ক'রে বসে আছেন। তাঁর স্ত্রীর অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাণপণ শক্তিতে কানে তুলো গুঁজে তিনি স্বামীর শার্ট আঁকড়ে বসে আছেন—তাঁর কোমল হাতের সুখস্পর্শে স্বামীর শার্টটার প্রায় পুরোটাই প্যাণ্টের বাইরে চলে এসেছে। বেশ কয়েকটা সীট্ আগে আর এক ভদ্রলোক তাঁর একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন; তারা একধার থেকে বমি ক'রতে সুরু ক'রেছে। প্লেনের কাগজের ঠোঙাগুলো তাদের মুখের কাছে ধরবার আগেই তারা জামাকাপড় ভরিয়ে ফেলেছে। ভদ্রলোক কি যে ক'রবেন ঠিক ক'রতে না পেরে শুধু শুধু 'এয়ার হোষ্টেস্'টির সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। এদিকে তুহিনের পাশের ভদ্রলোকের অবস্থা দেখলে হাসি পায়। তাঁর কাছে পানীয় বা লজেঞ্জুস-চকোলেটের ট্রেটা আনলেই তিনি সবকিছু এমন গো-গ্রাসে গিলতে আরম্ভ ক'রছেন যে, মনে হচ্ছে পৃথিবীর যে কোন

রকম খাবার যে কোন সময়ে উদরস্থ ক'রতে তাঁর বিন্দু-মাত্র বিরাগ নেই (অবশ্য যদি এই রকম বিনা পয়সায় মেলে)। এধারে যখন 'কোমরবন্ধ আঁটুন' (ফাস্‌ন্‌ ইওর বেল্ট্‌) লেখাটা জ্বলে উঠছে তখন তুহিনের নিজেরই বাধছে মুশ্‌কিল—বেল্ট্‌ বাঁধার প্রণালীটা সে কিছুতেই আয়ত্ত ক'রতে পারছে না। প্লেনের সেই 'এয়ার হোষ্টেস্‌'টি এগিয়ে এসে তুহিনের অবস্থা দেখে হেসে ফেল্লে। ছোট চামড়ার ছুটো ব্যাগ, বই, ক্যামেরা এগুলোকে ওপরের র‍্যাকে রাখলে যে আরাম ক'রে বসা যায় তা তুহিনের খেয়াল ছিল না। সেই মেয়েটি এগিয়ে এসে সেগুলো সব একরকম জোর ক'রেই তুহিনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওপরে রেখে দিলে। তারপর বেল্টের সঙ্গে তুহিনের ব্যর্থ যুদ্ধ লক্ষ্য ক'রে হেসে বল্লে, "ভ্যুৎ, আপনি কিচ্ছু ন'ন।" তারপর নিজেই তুহিনের বেল্ট বেঁধে দিলে। এবং শেষে আবার একটু হাসতেও ভুল্‌ল না, 'হ'লো ?' তুহিন তার পরাজয়কে চুপ ক'রে মেনে নিলে। কারণ, বুদ্ধির রসুইখানার বাবুর্চ্চি সে নয়,—বুদ্ধির ড্রইংরুমে সে হ'লো সৌখীন আগন্তুক। সেই আগন্তুকের মত হাসিতেই সে উত্তর দিল যেন মেয়েটিকে কৃতার্থ ক'রে, 'ধন্যবাদ'।

ইতিমধ্যে প্লেনের ডানার ঝট্‌পটানির সঙ্গে সঙ্গে তুহিনের মনের অজস্র চিন্তার ডানা-ঝট্‌পটানিও থেমে গেল।

গৌহাটি বিমানঘাঁটি এসে গেছে।

দুই

গৌহাটি থেকে শিলং প্রায় চৌষট্টি মাইলের কাছাকাছি। এই দূরত্বটুকুকে দূর বলা চলে না ;—কারণ, তুহিনের মতে দূরটা তখনই দূর, যখন সেটাকে দূর ব'লে মনে করার কারণ ঘটে। অর্থাৎ, দূরত্বের একঘেয়ে প্যানপ্যানানিটাই দূরকে দূর ক'রে তোলে। কিন্তু শিলং পাহাড়কে ঘিরে পথের যে পরিক্রমা, তার নিজেরই একটা সুর আছে, কথা নেই ;—তা মনকে বেঁধে রাখে, কথার আগলে নয়—সুরের আবেশে। তাই পথের সুরের সঙ্গে বাসের গতি যখন থামে, তখনও চেতনার সুপ্তি কাটে না। অবচেতন মন থেকে একটি প্রশ্ন শুধু বেরিয়ে আসে —"মাত্র এইটুকু !"

যা ভাল লাগে, তাকে সোজা কথায় ভাল লাগে বললেই তুহিন খুসী হয় বেশী। বুদ্ধিটাকে রেসের ঘোড়ার মত কল্পনার রাজত্বে ছুটিয়ে, নিজের পরিস্ফুট বক্তব্যটাকে অপরিস্ফুট ক'রে তোলার জন্যে বর্ত্তমানের 'অতি-রিয়্যালিষ্ট' (অর্থাৎ তুহিনের মতে সম্পূর্ণ বাস্তববিমুখ) কবিদের মত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পক্ষপাতী সে নয়। (যদিও বর্ত্তমান কবিদের কবিতা তাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে।) সেইজন্যই পাহাড়ের গায়ে ঘুরে-ওঠা পার্ব্বত্য পথটাকে দেখে রাইফেলের প্যাঁচানো ব্যারেলের কথা, অর্কিডের শুভ্র গুচ্ছ দেখে গলিত শবদেহের পাণ্ডুর শুভ্রতা, কিংবা পথের 'পরে পাইন-ফার্ণের পাতার কাল্‌চে-

সবুজ আস্তরণ দেখে পচা ড্রেনের জলে ভাসমান কালো আবর্জ্জনার সঙ্গে তুলনা করার কথা তুহিনের মনেই আসেনি। (এসব কিছুই তার মনে পড়ল না,—অথচ নিজের কবিতার আধুনিকতা সম্বন্ধে তার নিজের বেশ একটু গর্ব্ব আছে।) এ পথের কোথাও ক্লান্তি নেই, কোথাও অবসাদ নেই —অনায়াস গতিতে এ পথ এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বেগুনি অর্কিডের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন ক'রে পাহাড়ী ঝরনা উঠছে হেসে। আবার ঝরনার পটও যাচ্ছে পাল্টে, আসছে সীমাহীন পাহাড়ের ঢেউ। এইভাবে একসময় বাসের যান্ত্রিক গতির সঙ্গে 'গিয়ার চেঞ্জের' সুরের ওঠা-নামার পৌনঃপুনিকতা এল থেমে। বেলা প্রায় একটা-দেড়টার মধ্যে বাস এসে থামলো একটা ষ্টপ্-এ ; খাসিয়া পাহাড়ের ভাষায় তার খাস নাম হ'লো 'নাংপু', আর নামটা এখনো খোয়া যায়নি বহিরাগতের ভিড়ে। দু' দিকে গড়ে উঠেছে পাহাড়িয়া চটী,—ছোট একটা খাসিয়া পল্লীর মত—গায়ে গায়ে লাগানো কাঠের ঘর—দারিদ্র্যের পরিহার্য্য শ্রীহীনতাটা অপরিহার্য্যরূপে প্রকাশমান।

বাসে ব'সে ব'সে তুহিনের হাঁটুর হাড়গুলো তাদের চিরন্তন চলমানতার ধর্ম্ম ভুলে কতকটা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হচ্ছিল। আর বাসের ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর কুঞ্চন-প্রসারণের ফলে নূতন কিছু পরিপাক করাও আবশ্যক হ'য়ে পড়েছিল। তাই তুহিনকে নেমে একটা চায়ের দোকানের সন্ধান ক'রতে হ'ল। সন্ধানও পেল,—সন্ধান লাভ না করাই কঠিন। কিছুক্ষণ পরে পেটে চায়ের ট্যানিক এ্যাসিড ও গ্যাসট্রিক্ জুসের ক্রিয়া আরম্ভ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজ্‌ল। বাসের পেটের তেলও গরম হ'য়ে উঠলো—'একজষ্ট পাইপ' থেকে বেরিয়ে এল একরাশ পীতাভ পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া—গন্ধটা মন্দ লাগে না। লোহা-লক্কড়ের গোঙানি ডুবে যায় ধোঁয়া আর গ্যাসের গর্জ্জনে। আবার বাসের একটানা বিবর্ত্তন—উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা পথকে অবিশ্রান্ত পরিক্রমণ। একপাশে অতলস্পর্শী খাদ, আর একপাশে পাহাড়-প্রাচীর—এর মধ্যে দিয়ে যাত্রিপূর্ণ, স্থূল-কলেবর বাসকে নির্ভুলভাবে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে সহজ নিপুণতার প্রকাশ ছিল, তার সঙ্গে তুহিনের পরিচয় নতুন। সেইজন্যে সে একটু বেশী ক'রে তার দর্শনেন্দ্রিয়গুলিকে উন্মুখ রেখেছিল। ঘুমও তাই সেগুলোকে আশ্রয় ক'রতে পারেনি। পৃথিবীর এ প্রান্তে যখন দিনের কাজ শেষ,—লেন-দেনের কারবার মিটিয়ে আলোর পসরা গুটিয়ে আকাশের সূর্য পালাবার উপক্রম ক'রছিল, অন্য প্রান্তে তখনই তুহিনদের বাসটা শিলং বাস-ষ্টেশনে প্রবেশ ক'রল।

শিলংয়ের মাটিতে পা দিয়েই তুহিন দুটো বস্তুকে খুব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করলে। একটি হচ্ছে শীতের অল্প আমেজ, আর একটি হচ্ছে তার বিশেষ কয়েকটি ইন্দ্রিয়কে অশেষ ক'রে খাটিয়ে নেওয়ার শ্রান্তি। তাই বাস থেকে নামতে না নামতেই যখন একটা নতুন বিপত্তি দেখা দিল তখন তুহিন প্রথমটা বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার সহজাত সপ্রতিভ কথা বলার ভঙ্গীটার জন্যে সেটুকু কাটিয়ে উঠতে তার বেশী দেরী হয়নি। তুহিনের স্বর্গীয় পিতার বন্ধুকন্যাদ্বয় রিমি ও

রিনি হঠাৎ নিউটনের 'ল-অফ্-গ্র্যাভিটেশন' আবিষ্কারের মত তুহিনকে আবিষ্কার ক'রে যেন একেবারে অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে পড়লো। তুহিন মাথার ফেল্ট্ হ্যাটটা নামিয়ে, নিজের শারীরিক শ্রান্তির কথা জানিয়ে যখন একটা ট্যাকসিতে গিয়ে চাপলো তখনও সে এই বিংশতিবর্ষীয়াদের হাত থেকে মুক্তি পায় নি। তাই পরে দেখা করার কথা দিয়ে তুহিন খুব তাড়াতাড়ি তার নিজের মুক্তির পথটা প্রশস্ত ক'রে ফেললো।

তিন

তুহিনের মত ছেলের যে কি ভাল লাগে আর কি ভাল লাগে না, তা বোধহয় ওর নিজেরও ভাল ক'রে জানা নেই। তাই হঠাৎ সন্ধ্যের সময় কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তার খেয়াল হ'লো বেড়াতে বেরুবে বাইরে আর দেরী না ক'রে—কিন্তু ফিরবে বেশ রাতে অর্থাৎ দেরী ক'রে। ইচ্ছে ক'রেই রাতের একটু অংশ সে পথেই খরচ ক'রবে। আজকের এই ইচ্ছেটা কিন্তু ওর স্বভাববিরুদ্ধ। কারণ, পথ চলার আনন্দটা সে ঘরে বসেই উপভোগ ক'রতে ভালবাসে বেশী। তুহিন বলে, 'যাদের মন চলে অল্প, তাদেরই পা চলে বেশী'।—অর্থাৎ, পথ চলার সময় তাদের মনটা অযথা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায় না, আর সেইজন্যেই তারা নির্ব্বিঘ্নে পথ চলতে পারে অনেকখানি। তুহিনের নিজের অবস্থা হ'লো ঠিক তার উল্টো—তার মনটা এত দ্রুত চলতে থাকে যে, পা দুটো তার সঙ্গে তাল রাখতে না

পেরে থেমেই যায়। ফলে মন এত বেশী চলে যে, আর কিছু না হোক গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনাটা এড়ান বেশ কষ্টকর। কারণ, পৃথিবীতে মনই শুধু চলে না, গাড়ীও চলে।

আজ কিন্তু শিলংয়ের নির্জ্জন পাহাড়ী পথে নেমে তুহিনের নিজেকে বড় অপরাধী ব'লে মনে হ'লো,—এপ্রিলের এই পরিপূর্ণ রাতকে উন্মুক্তভাবে উপভোগ ক'রতে না পারাটা অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তরুণীর দেহ-সৌরভের মত রাতের তনিমার নিবিড় গন্ধে চারিদিক পরিপূর্ণ। আকাশে অসংখ্য সবুজ তারার ইসারা। মরশুমী ফুলগুলো চাঁদের আবছা-স্বপ্নিল আলোয় যেন চরম ফুটে ওঠার আনন্দে অজস্র কথা বলছে। উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথের ওপর দীর্ঘ পাইন গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হ'য়ে পড়ছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় চেনা দিনের জগৎটা অচেনার স্বপ্নে গেছে হারিয়ে। তুহিন বাজারের উল্টো পথ ধরেই হাঁটতে বেরিয়েছিল, কিন্তু এ পথটিও যে ঘুরে বাজারেই গেছে তা তার খেয়াল ছিল না। ফলে, দোকান-পাটের রাজত্বে রিমি-রিনির অদূরে নিজেকে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার ক'রে তুহিন প্রথমটা একটু অবাকই হ'য়ে গিয়েছিল। তবে তার গায়ের কালো ওভারকোটটা তাকে একটা ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছিল ব'লে ভগিনীদ্বয়ের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে সে নিঃসন্দেহেই বাদ পড়ে গিয়েছিল। দুই বোনেরই পরনে রয়েছে দুটো গাঢ় রঙের জাম্পার—যদিও 'ডীপ্ কলার'টি রিমির চেয়ে তার কনিষ্ঠা রিনিকেই মানায় বেশী। কারণ, বর্ণের উজ্জ্বলতায়

সে তার দিদিকে অতিক্রম ক'রেছে অতিপ্রাকৃতরূপেই। পিতা সুশোভন ব্যানার্জির ব্যবহারিক জীবনের সঞ্চিত অর্থে তাদের দুই বোনের অবাধ অধিকার, অর্থাৎ কলেজীয় বন্ধু-বান্ধবীর 'বার্থ-ডে'তে তারা ইমিটেশান পার্লের বদলে আসল পার্লের মালাই প্রেজেণ্ট ক'রতে ভালবাসে বেশী। কিন্তু, এখন তাদের মুশ্‌কিল বেধেছে গাড়ীর ড্রাইভারকে নিয়ে। ওরা যখন ওদের লিপ্‌ষ্টিক্‌ দেওয়া ঠোঁটের মধুবর্ষণে আর ভ্যানিটি ব্যাগের সঞ্চিত রৌপ্য-বর্ষণে বিক্রেতার মনকে ক'রে তুলেছিল সরস, তখন ড্রাইভার বেচারীও একেবারে নীরস না থেকে অদূরে কোথাও গিয়েছিল আড্ডায় রস সংগ্রহ ক'রতে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রয়োজন-অতিরিক্ত (বা অপ্রয়োজনীয়) জিনিষ কিনে দুই বোনে গাড়ীর ষ্টিয়ারিং সংলগ্ন হর্ণটির উপর তাদের 'কিউটেক্স'-বিমণ্ডিত ক্ষীণ অঙ্গুলিস্পর্শে ক্ষীণতম ধ্বনি সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসে প্রায় ঘেমে উঠছে দেখে, তুহিন এগিয়ে এসে মৃদু হেসে বলে, "বিধাতা তোমাদের এত দেন যে, যা দেন সেগুলোর কলাকৌশল পর্য্যন্ত শিখিয়ে দেওয়ারও তাঁর সময় থাকে না। ফলে, সুইচ না টিপেই হর্ণ নিয়ে টানাটানি কর ; আর হর্ণ তো বাজেই না, বরং সমস্ত এ্যামেরিকান গাড়ীগুলোকে খুব বেশীরকম বাজে বলে মনে হয়।"

তুহিনের আকস্মিক আগমন আর আকর্ষিক বাচনভঙ্গী দুইই ছিল নাটকীয়। কিন্তু শেষেরটির চেয়ে আগেরটি তার 'বন্ধুনী'দের প্রিয় ছিল বেশী। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে, তুহিনের very presence-ই তাদের কাম্য, বাচনের

proficiency নয়। যাই হোক, তুহিনের কথায় প্রথমেই দুই বোন উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়লো—অর্থাৎ হাসল যত, তার চেয়ে চেঁচাল বেশী। কিন্তু তার জন্যে ওদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, হারমোনিয়ামের শেষ রিডের মত গলাটাকে উচ্চতম ধাপে চড়িয়ে তীক্ষ্ণতম কণ্ঠে হেসে ওঠাই আলট্রা-মডার্ন হওয়ার চরম প্রকাশ—তাতে আর কিছু না হোক্, অদূরবর্ত্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা খুব অসম্ভব হয় না। কিন্তু সেটা যে সব সময় কর্ণ-পরিতৃপ্তিকর না হ'য়ে, কর্ণপটাহ বিদীর্ণ ক'রে চিন্তায় বিপত্তি আনে তা বোধ হয় ওরা খেয়াল করে না। তুহিন বলে, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশী আত্মসচেতন ব'লেই তারা বেশী আত্মনিমগ্ন। আর তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে তারা নিজেদের চিন্তায় মশগুল হ'য়ে যখন হাবুডুবু খেতে থাকে তখন প্রবল বিতৃষ্ণায় বা তুমুল হাসির বেগে যদি দর্শকের মুখে কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়, তবে সেটাকেও তারা তাদের প্রাপ্য প্রশংসার অংশ হিসেবেই ধরে নেয়। অর্থাৎ মদি-রাক্ষীদের পক্ষিকণ্ঠের হাসি অন্যের কর্ণে সুধা না ঢেলে, যদি অকারণে চেয়ার-টেবিল টানাটানির মত শব্দ উৎপাদন করে এবং অশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে, তাহ'লেও ওরা বেশী আত্মনিমগ্ন থাকে ব'লেই বোধ হয় বুঝতে পারে না।

যাই হোক্, সরস্বতী পূজোর পরের দিন যখন সমস্ত এ্যামপ্লিফায়ারগুলো স্তব্ধ হ'য়ে আসে—অর্থাৎ, সম্মিলিত হিন্দী-গানের ক্লান্তিকর অসহ্য পুনরাবৃত্তি যখন থেমে যায়,—তখন যেমন প্রতিবেশী নিজের অজান্তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে—

ঠিক তেমনি ক'রে তুহিনের বুক থেকেও একটি ছোট্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো রিমি-রিনির অতিদীর্ঘ হাস্যপর্ব্বের অনতি-কাল পরেই। এরপর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তুহিন যখন বিদায় প্রার্থনা ক'রল—তখন তাকে সত্যি সত্যিই দেবী-অর্চ্চনার পদ্ধতি গ্রহণ ক'রতে হ'লো। অবশেষে 'কালকে প্রাতেই' রিমিদের বাড়ীতে প্রাতরাশের কথা দিয়ে তবে তুহিন ছুটি পেল—যদিও ছাড়া পাওয়া হ'লো না। কারণ, রিমি নিজে ড্রাইভ ক'রে তুহিনকে তার কটেজে পৌঁছে না দিলে রিমির ড্রাইভিং লাইসেন্সটাই নাকি ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। অথচ যার লাইসেন্সটার দাম বেশী, সেই সোফারকেই যে আজ এ্যাক্‌সিলারেটার ছেড়ে চরণযুগলের উপর নির্ভর ক'রতে হ'লো —অর্থাৎ একটি দিনের জন্যেও যে তার লাইসেন্সটার মূল্য ব্যর্থ হ'লো, সে কথা রিমি একবার ভেবেও দেখলে না। প্রস্থানোদ্যত সোফারকে একটি নোট দিয়ে রিমি স্টার্টারে হাত দিলে।

চার

লাইমোখরার একটি কটেজ,—রিমি ব্যস্ত তার প্রভাত-প্রসাধনে; রিনি এখনো লেপ ছাড়েনি। আর সুশোভনবাবু অর্থাৎ রিমি-রিনির পিতা গতকালের খবরের কাগজটার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে সুমসৃণ গালে সফেন ব্রাসটা বুলিয়ে চলেছেন।

এদিকে তুহিনের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত—শিলংয়ে এসে

সে এত ভোরে বিছানা থেকে ওঠে যে, সারা শিলং তখন ঘুমিয়ে থাকে। এই শীতের দেশে এত ভোরবেলায় ওঠা কাজটা একটা নেহাৎ সৃষ্টিছাড়া অসভ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এইরকম সৃষ্টিছাড়া বেমানান কিছু একটা না ক'রতে পারলে তুহিনের যেন শান্তি হয় না। অবশ্য বেমানান কিছু একটা ক'রে নিজের বিজ্ঞাপন বাড়িয়ে তোলাই তার ইচ্ছে নয়,—বেফাঁস কাজ ক'রে নিজেকে লোকের অপ্রিয় ক'রে তুলতেই তার বেশী ভাল লাগে। কারণ, তুহিন নির্জ্জনতাকে ভাল না বাসলেও নীরবতাকে অবশ্যই বেশী পছন্দ করে। তাই সে জনতাকে সব সময়ই পাশ কাটিয়ে চলতে চায়,—দূর থেকে জনতার কলকণ্ঠ সে যদিও সহ্য ক'রতে পারে, কাছের কলরব তার কাছে অসহ্য। সেইজন্যে অধিকাংশ দিনই, সারা শিলং সহর যে সময়ে ঘুমে অচৈতন্য, তুহিন তখন প্রাতর্ভ্রমণে মগ্ন।

এপ্রিলের নরম সকাল—রোদ বা শীতের কোনটারই তীব্রতা নেই। কোলকাতায় এই সময় আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে থাকলেও বুকের বোতামটা খুলে দিলেই যেন ভাল লাগে। এখানে এই সময় গরম ট্রাউজারের ওপর কোট প'রে কলারটা তুলে দিলেই যেন বেশ আরাম লাগে। কচি ঘাসের ওপর নানা রঙের ছিটের মত এখানে অজস্র ফুল ফুটে থাকে। তাদের কোনটি বেশ বড় আবার কোনটি স্বাভাবিক ঘাস-ফুলের মতই ছোট। মনে হয়, নেহাৎই কোন খেয়ালী আর্টিষ্ট আপন-মনে আঁকতে আঁকতে মাঝে মাঝে তুলি ঝেড়ে নিয়েছেন, আর তারই ছোট-বড় রঙের ছিটে ঘাসের বুকে ফুল হ'য়ে উঠেছে ফুটে।

চারিদিকে ফোঁটা ফোঁটা শিশির টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে ঝরে পড়ছে—তারার কুঁচোর মতই তাদের উজ্জ্বলতা ;—চলতে গেলে জুতোর ধারে ধারে মরা ঘাসের সঙ্গে শিশির জড়িয়ে যায়। পাইনের লম্বা লম্বা ছায়া আর সবুজ ঘাসে মোড়া একটা পায়ে-হাঁটা পথ ঝরনার দিকে নেমে গেছে। তুহিন ধীরে ধীরে সেই পথ ধরে নীচে নেমে গিয়ে ঝরনার গা ঘেঁষে বসে। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হয় ট্র্যাজেডি জিনিষটা বুঝি বিশ্বকর্ম্মার ঠিক পছন্দসই নয়, তাই পূর্ণতা সৃষ্টিতে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। এত পূর্ণতার মাঝে মানুষও তাই ট্র্যাজেডিটাকে কিছুতেই আপন ক'রে নিতে পারে না ; বিচ্ছেদের পরেও নতুন ক'রে মিল খুঁজে আনে ; দক্ষযজ্ঞ আর সতীর দেহ বিলোপের পরেও আবার নূতন শিবায়ন কাব্য রচিত হয়—হিমালয়ের কন্যা হ'য়ে দুর্গাকে আবার জন্ম নিতে হয়। তারপর আবার প্রজাপতি নিয়ে আসেন শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ ; পূর্ব্বরাগে দুর্গার মুখ আরক্তিম হ'য়ে ওঠে। সবটুকু খবর শোনবার আগ্রহ, অথচ পিতার সামনে নিজের বিবাহ প্রস্তাব শোনার লজ্জায় তরুণী গৌরী যখন নতমুখী, সেইসময় তাকে পরিত্রাণ করবার জন্যে কালিদাসকে লিখতে হয়,

"......লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী..."

পদ্মের রক্তিম পাপড়িগুলি বিশেষ মনোযোগসহকারে একটি একটি ক'রে না গুনলে যেন গৌরীর জীবনে অনেক কিছুই বাকি থেকে যায়—এমনি একটি ভাব তার আনত চোখের দৃষ্টিতে। কিন্তু পদ্ম-কোরকের সবটুকু রাঙ্গিমা যে তার নিটোল কপোলের

ওপরেও আভাসিত হ'য়ে উঠেছে তা বুঝি সে নিজেও জানতে পারেনি।

এদিকে রিমি আরও একবার রুজের গোলাপী তুলিটা (একালের লীলা-কমলই বলা যায় তাকে) আল্‌তোভাবে তার গালে বুলিয়ে নিয়ে আয়নার দিকে শেষবারের মত চাইল। কিন্তু কিছুতেই যেন তার মন উঠছে না— কিছুতেই সাজটাকে সে ঠিক চোখে না পড়ার মত করতে পারছে না। কারণ, সকালবেলার সাজের ঘটা যদি রিনির চোখে পড়ে তবে তার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ থেকে সে নিশ্চয়ই রিমিকে বঞ্চিত করবে না। রিনি কথা অল্প বলে বটে, কিন্তু যা বলে তার ধার নেহাৎ অল্প নয়। আর যখন বলে তখন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একেবারে বেআব্রুভাবেই বলে। তার ফলে রিমি বেচারীর হ'য়েছে মুশ্‌কিল। কারণ, দেহের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আর নিরাভরণ সাজের স্বাভাবিকতা এই দুইয়ের প্রভাবে রিনি নিজেকে প্রসাধন থেকে দূরে রাখতে পারলেও রিমির পক্ষে তা সম্ভব নয়। সে সাজও ভালবাসে, সাজাতেও ভালবাসে। অথচ সকালবেলায় বাড়ীতে বসে থাকার জন্যেই সাজের ঘটা বাড়িয়ে তোলা ব্যাপারটা সত্যিই একটু দৃষ্টিকটু। তাই সজ্জাটাকে সযত্ন অবহেলায় দৃষ্টির সরাসরি প্রভাব এড়িয়ে দ্রষ্টব্য ক'রে তুলতে না পেরে রিমির যেন কান্না পাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়েই তুহিনের আগমন ঘটলো, আর দ্বারে তার করস্পর্শের শব্দে রিমির হাত থেকে পাউডারের তুলিটা পড়ে ড্রেসিং টেব্‌ল্‌টা পাউডারের গুঁড়োয় ভরে গেল।

রাগে মুখের ওপর তোয়ালেটা জোরে বুলিয়ে রিমি এগিয়ে গেল দ্বারের দিকে।

'সুপ্রভাত!' রিমি হাত তুলে ছোট্ট একটি নমস্কার জানাল, আর তারই প্রত্যুত্তরে তুহিন সহাস্য প্রতিনমস্কার জানিয়ে ভেতরের দিকে রিমিকে অনুসরণ ক'রল।

'বাবা, তুহিন এসেছে'—

রিমির কণ্ঠ-তীক্ষ্ণতায় সুশোভনবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইতেই তুহিনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তিনি নিজেই উঠে গিয়ে তুহিনের সঙ্গে বিদেশী কায়দায় করমর্দ্দন ক'রে তার কাঁধে হাত দিয়ে এনে একটি সোফায় বসিয়ে দিলেন। তুহিন অনেকদিন থেকেই জানে যে সুশোভনবাবু বিলিতি সেক্‌হ্যাণ্ড্‌টাকেই দেশী প্রণামের চেয়ে বেশী পছন্দ করেন। তাই সে দ্বিরুক্তি না ক'রেই হাতটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, আর বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে সোফায় বসে পড়েছিল। সুশোভনবাবুর সঙ্গে শিষ্টাচারের জন্যে তুহিন যে ক'টা কথা বলেছিল সেগুলো নাকি নেহাৎই কোন যান্ত্রিক মানবের উক্তি, তুহিনের নিজস্ব নয়। তাই সেগুলো বাদই দিয়ে দিলাম, আর তুহিন নিজেও কিছুক্ষণ পরে রিনির খোঁজে উঠে গিয়েছিল। ফলে, পূর্ব্ব প্রসঙ্গের যতির সঙ্গে নতুন প্রসঙ্গের গতি আপনিই সুরু হ'য়েছিল।

সৌজন্য-প্রকাশের বদলে ছোট্ট একটি হাই তুলে রিনি তুহিনকে নিজের বিছানারই প্রান্তে বসবার নির্দ্দেশ দিলে। ইতিমধ্যে তার প্রভাতীয় বেশবিন্যাস যদিও সমাধা হয়েছিল,

তবু প্রভাতী ঘুমের সমাধি হয়নি সম্পূর্ণরূপে। তাই দ্বিতীয়বার লেপটা টেনেছিল—ঘুমটাকে উপভোগ করবার জন্যে নয়—ঘুমের জড়িমাটাকে জেগে জেগে সম্ভোগ করবার জন্যে। গলার সরু সোনার হারটা ঠোঁটের ওপর রেখে রিনি সামনের ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছটার দিকে চেয়ে চুপটি ক'রে শুয়ে ছিল। কলেজের তাড়া নেই—ইকনমিক্স্ বা হিষ্ট্রির ভয় নেই—শুধু শুয়ে শুয়ে ঘুম কিংবা দিদিকে রাগানো। রিনি হয়তো এমনি ক'রে ভেবেই চলতো, আর ইচ্ছে না থাকলেও একসময় ঘুমিয়েই পড়তো। কারণ, রিনি অনেক সময় দেখেছে মাথাটা বেশ হাল্কা থাকলে, চুপচাপ শুয়ে কিছু ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুম আসে সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারে না। ঘুমের ঠিক আগে চিন্তার ধারাগুলো সব এলোমেলো হ'য়ে আসে—খুব হাল্কা হ'য়ে ধীরে ধীরে ঘুমের রঙের সঙ্গে মিশে যায়। আজকেও ঠিক তাই হ'তো যদি তুহিন এসে না পড়তো। তুহিনকে বিছানার এক প্রান্তে বসিয়ে, নিজে ঠিক খাটের বিপরীত দিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে কোমর অবধি লেপটা টেনে রিনি বলে—"তুহিনদা', আপনি—"

"তুমি আর আপনি এই দুটি শব্দের তফাৎ কোথায় জান রিনি, ঠিক দেশলাই কাঠির দুটি বিপরীত প্রান্তের মত—যে প্রান্তে 'তুমি', সেই প্রান্তেই বারুদ। একটু ঘষে নিলেই আগুন জ্বলে ওঠে আর তখন কথার পর কথা ধরিয়ে নেওয়া বিশেষ শক্ত হয় না। কিন্তু 'আপনি' শব্দটা হ'লো বারুদের ঠিক উল্টো দিকে শুধু কাঠির দিকটার মত। হাজার রগড়ারগড়ি

ক'রেও কথার আগুন জ্বালান যায় না। আর কোন মেয়ের মুখোমুখি ব'সে কথা হারিয়ে ফেলা ব্যাপারটাকে আমার বড্ড ভয়। কারণ, তাহ'লেই তাদের প্রাধান্যকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। অর্থাৎ তারা ইচ্ছে করলে ভাবতেও পারে যে, 'ছেলেটা কি সেন্টিমেন্টাল, দুটো মিষ্টিকথাতেই প্রেমে পড়ে গেল। সুতরাং...' "

তুহিনের এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়া কথাটার শেষ শব্দের রেশ টেনেই রিনি ব'লে ওঠে, "সুতরাং 'তুমি' দিয়ে আরম্ভ করাই ভাল, কি বল তুহিনদা'।"

তুহিন জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—বাইরে নেশপাতি আর আপেল গাছগুলো ফুলে ভ'রে গিয়েছে, তাদের পাশ দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ নিচের দিকে নেমে গেছে। সেইদিকে চেয়ে তুহিন নেহাৎই অন্যমনস্কভাবে প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন ক'রলে, "আচ্ছা রিনি, মানুষ যদি তার 'তুমি-আপনি' দিয়ে গড়ে ওঠা ভাষার ভারী বোঝা নামিয়ে ঐ পথ দিয়ে ক্রমাগত চলতেই থাকে,—ধর তুমি আর আমি ঐ পথ ধ'রে শুধু চলছি আর চলছি—কোন কথা নেই, শুধু চলা। শাঁখের মত শাদা আকাশটা নীল হয়ে আসবে, ঐ পথ ধ'রে একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে যাব,—কত পাইন আর ঝাউয়ের বন পেছনে থাকবে পড়ে,—আমরা চলব আর চলব—লাল কাঠগোলাপের পাপড়ি-ভরা পথ পেরিয়ে দূরে, অনেক দূরে। তারপর রাত হ'লে পথের ধারেই দুজনে বসে পড়ব—তোমার মুখে পড়বে তারার আলো, আবছা

আঁধার জমবে চোখের পাতায়, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে··· আর—"

"আর থাক্ তুহিনদা', তুমি যে কবিতা লেখ তা আমি অনেক আগেই জানি। এবার চল, চা খাবে চল—দিদি হয়তো রাগে ফুলছে।"

সত্যিই রিনি তুহিনকে বেশ ভালভাবেই জেনেছে। তুহিন কবিতাও লেখে, কবিত্বও করে; কিন্তু ঠিক ততটুকু যতটুকু ওর নিজের ভাল লাগে। যদি তুহিন বোঝে তার কবিতা বা কবিত্ব অন্য কারুর ভাল লেগেছে তাহ'লেই সে বেফাঁস কিছু একটা ব'লে পরিস্থিতিটাকে একেবারে বেখাপ্পা ক'রে তোলে। হয়তো তখন সে কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দালালির কথা বা শেয়ার মার্কেটের নানান ঝামেলার কথা এক নিঃশ্বাসে বলতে স্থুরু করে। তাই রিনি যখন তুহিনের কবিত্বটাকে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইল তখন সে মনে-মনে খুসীই হ'লো। কিন্তু মুখে একটু করুণ ভাব নিয়ে বল্লে, "তুমি কি ভাবছ আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কবিত্ব করছিলাম, রিনি। শেলী কি বলেছেন জান তো : Most wretched men are cradled into poetry by wrong··· কিন্তু আমাকে রেচেড্ বলবে কোন্ হিসেবে বল, যখন রিনির মত মেয়ে আমার সহায়।"

"না, রিনি মোটেই তোমার সহায় নয়, এবং 'চা লইয়া বিব্রতা' রিমির অসহায় অবস্থাটা চিন্তা ক'রে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও।"

তুহিনের গলার স্বরটা যদিও বিশেষ উঁচু নয়, তবু ছোট

চায়ের আসর জমাতে (বিশেষ ক'রে মেয়েদের) তাকে খুব বেশী বেগ পেতে হয় না। ফলে চা-পর্ব্বটা শেষ হ'লেই তার ওঠা হ'য়ে ওঠে না,—আরও কিছুক্ষণ রেশটা টেনে যেতে হয়। আজও তাই সুদীর্ঘ চা-পর্ব্বের পর তুহিন একেবারে অধৈর্য্য হ'য়েই পণ ক'রেছিল যে, এবার সে সোজা এমন জায়গায় হেঁটে যাবে যেখানে নিজেকে কোন কথা বলতে হবে না, শুধু অপরে কথা বলে চলবে কানের কাছে অহরহ—অর্থাৎ বাজারে। সেখানেও মেয়ের ভিড়ের কম্‌তি নেই,—তবে তারা পাঁচটা বাঙ্গালী মেয়ের মত নিজের সত্তাকে সজ্জার ভ্যানিটি ব্যাগে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে চায় না। বিচিত্র মুখভঙ্গী, কথা ও হাসির নিঃসঙ্কোচ প্রকাশে অনিঃশেষ প্রাণপ্রাচুর্য্যকেই তারা মূর্ত্ত ক'রে তোলে বিদেশীর দৃষ্টিসীমায়।

তুহিন বেশ জানে যে প্রাণ জিনিষটা বড্ড বুনো ; কিন্তু তবু তার প্রকাশকে অস্বীকার করা যায় না। সে প্রকাশের প্রয়োজন অপরিহার্য্য, ঠিক যেমন অপরিহার্য্য মানুষের অপরাপর জৈব প্রেরণা। কিন্তু আজকের বাঙ্গালী (বিশেষত বাঙালিনী) তা অস্বীকার করতে চায় তার কালচারের কল্পনা দিয়ে। অর্থাৎ যক্ষ্মার পোকার মত কালচারই বাঙ্গালীর প্রাণকে ভেতর থেকে দিচ্ছে ফোঁপরা ক'রে, আর তার জীর্ণ দেহের শীর্ণ কণ্ঠ বেয়ে যে রক্তের ঝলক উঠে আসছে তা তার প্রাণের প্রকাশ নয়, মৃত্যুর বিভাস। তাই তুহিন তার সুদীর্ঘ কলেজ জীবনে যত মেয়ে যত ছেলের সঙ্গে মিশেছে সবাইকার চোখে দেখেছে মরা হাসি আর মরা কথার নিষ্প্রয়োজন সমারোহ।

বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত ছাত্রজীবনের দীর্ঘায়িত পথপরিক্রমার পর তুহিন ডিগ্রী একটা নিশ্চয়ই পেয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সে নিশ্চিতরূপেই বুঝেছিল যে আর পাঁচজন বাঙ্গালীর মত সেও ক্রমশঃ কালচার-কীট-দষ্ট হ'য়ে পড়ছে। তাই প্রাণের প্রকাশ যে-কোন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে দেখলে তুহিন আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এখানে বাজারে খাসিয়া মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাণচঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি উপভোগ করবার জন্যে তুহিনের নিজস্ব মুহূর্ত্তগুলির অপচয় হয় বটে, কিন্তু তুহিন নিজে সেগুলিকে জীবনের সঞ্চয় বলেই মেনে নেয়। তাই নিতান্ত অপ্রয়োজনে বাজারে ঘোরাটা তুহিনের একান্তই প্রয়োজন। তার মতে হাঁটতে গেলে হয় একেবারে জনশূন্য প্রান্তরে, আর না হ'লে একেবারে জনতারণ্যে,—কারণ নির্জ্জনে বা জনতারণ্যে দুইয়ের মাঝেই নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সাহারায় ঘুরে বেড়ালে বা জগুবাবুর বাজারে টহল দিলে কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না যে—আমি কে, কি জন্যে ঘুরছি, কেন ঘুরছি, ঘুরলে কালচারে বাধে কিনা··· ইত্যাদি।

আজও প্রাতঃকালীন চা-পর্ব্বের পর তুহিন বাজারের পথেই পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু মুশ্‌কিল বাধল রিনিকে নিয়ে। সেও সঙ্গে যেতে চায়, তবে বাজারে নয়—অন্য কোথাও। তুহিন বুঝেছিল, আর একটু বিদ্রূপ ক'রে বলেও ছিল, "রেষারেষি যেখানে নেই, ব্যবসাদার ডাক্তার সেইখানেই প্র্যাক্‌টিস্‌ জমাতে ভালবাসে। আর জনতা যেখানে নেই, আত্মপ্রচারের সুবিধে

সেইখানে বেশী ব'লেই মেয়েরা নির্জ্জনতা খোঁজে।" এরপর রিনিও কয়েকটা কথার তীর ছুঁড়েছিল বটে, কিন্তু তুহিন পাকা তীরন্দাজ ব'লে এড়িয়ে যেতে কষ্ট হয়নি। তবে রিনি সেই যে একটা নিরপেক্ষ ভাব ধারণ ক'রেছিল, সারা পথে আর তার পরিবর্ত্তন হয়নি। বাজারের মাঝে এলোমেলো ভাবে তারা ঘুরে বেড়ালো। সিল্কের ওড়না-বাঁধা সুন্দরী খাসিয়া মেয়েরা সবেমাত্র তাদের নিদ্রালস চোখ খুলে সব্জীর ওপর জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। নেভি-ব্লু বা কমলারঙের ওড়না-বাঁধা একরাশ মেয়ে, আর তারই মাঝে মাঝে সবুজ সব্জীর সমারোহ! অল্প দূরে যে মেয়েটি বসে আছে, তার বসার ভঙ্গিটা এত সহজ, সরল, অনায়াস যে সহজে চোখ ফেরান কঠিন,—ওপরের ঠোঁটটা দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে, ভুরুটা একটু কুঁচকে যেন দয়া ক'রে এর-ওর মুখের দিকে চাইছে। কিন্তু রিনি যে চোখ খুলেও কোন দিকেই চাইছে না—তুহিন পড়েছে মুশ্‌কিলে। শেষে ফেরবার সময় যখন তুহিন রিনিকে কথা দিল যে কাল তারা জনতাকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে গাড়ী নিয়ে একেবারে নির্জ্জন চেরাপুঞ্জীর পথে রওনা হবে, তখন যেন রিনির 'মুড' ফিরে এল।

পাঁচ

তুহিন ভোরবেলা বেরিয়েছিল চা না খেয়েই, অথচ ফিরল যখন তখন চা খাওয়ার সময়টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ বেলা তখন প্রায় ন'টা বাজে। ক্লান্ত হ'য়ে ইজি-চেয়ারে নিজেকে সম্পূর্ণ ইজি ক'রে সাদা শালটা বুক অবধি টেনে কিপ্‌লিঙ ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে কখন যে চোখ বুজে গিয়েছিল তা তুহিন বুঝতে ঠিকই পেরেছিল—তবে অবুঝ না হ'য়ে পারেনি। শেষে রিনির ডাকাডাকিতে ঘুম যদিও ভাঙল তবে দশ মিনিটের মধ্যে স্নানাহার সারা ছাড়া উপায় ছিল না। দরজার বাইরে পা দিয়ে কিন্তু তুহিনের মনটা ভীষণ ভাবে ব্রেক্ ক'ষল—এখন ব্যাক্ গিয়ার দিয়ে পিছু হাঁটা যায় কিনা সেই কথাই ভাবছে। তার অবশ্য ছুটো কারণ, প্রথমতঃ রিনিদের গাড়ীটা খারাপ হ'য়ে যাওয়ায় সে যে নতুন মোটরটা জোগাড় ক'রেছিল, চেহারার দিক দিয়ে সেটা নতুন ছিল না, অর্থাৎ ছোট্ট একটি প্রাচীন ফোর্ড-প্রিফেক্ট। তার জানলার কাঁচগুলো জলহাওয়ার সঙ্গে অযথা বিবাদ না ক'রে অনেকদিন আগেই ধূলির সঙ্গে ধূলিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। দরজাগুলো একমাত্র বাইরের দিক থেকেই খোলা সম্ভব ছিল, ভেতরের হ্যাণ্ডেলের জায়গায় শুধু ছুটি গর্ত্তই অবশিষ্ট আছে। এছাড়া দ্বিতীয় কারণ হ'লো আকাশের মেঘ। রাস্তার অভিজ্ঞতা রিনির না থাকলেও তুহিনের আছে। তাই গাড়ী

আর মেঘের অবস্থা দেখে তার ভয় পাওয়াটা নেহাৎ অযৌক্তিক হয়নি। কারণ পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় সেখানকার পিচ্ছিল রাস্তায় মেঘ মাথায় ক'রে ভাঙা গাড়ীকে নির্ভর ক'রে যাওয়ায় রোমান্স থাকলেও রহস্যের কম্‌তি ছিল না ; যে কোন মুহূর্তে চেরাপুঞ্জী দর্শনের বদলে স্বর্গদর্শনও খুব শক্ত ছিল না। কিন্তু দুনিয়ায় কোন কিছু শক্ত থাক্ বা না থাক্, পুরুষের সব শক্তিই যে নারীর অল্প কথা, অল্প বাধা আর অল্প চাউনিতে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ভেসে যায়, এ ইতিহাস নতুন নয়। তুহিনই কলেজের এক প্রফেসারকে বলতে শুনেছে যে, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রার নাকটা যদি একটু খাটো হ'ত তাহ'লে নাকি সারা রোমান্ হিষ্ট্রিটাই পাল্টে যেত। সে যাক্, কিন্তু রিনির নাক ক্লিওপেট্রার নাকের থেকে খাটোই হোক্ বা চ্যাপ্‌টাই হোক্ তুহিনের যাত্রার প্রোগ্রামটা যখন বাতিল হ'লো না, তখন ওয়াটারপ্রুফটা কাঁধে ফেলে রিনির পাশের সীটটায় বসা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

একপাশে অর্কিড আর ফার্ণে মোড়া পাহাড়-প্রাচীর, অন্যপাশে অতলস্পর্শী খাদ—আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ক্রমেই কুয়াশা আর মেঘে ঢেকে যাচ্ছে—ড্রাইভার ওস্তাদ, তাই সাহস। দূরত্ব যতই কমে আসছে, পাহাড়ী ঝরনার অবাধ প্রকাশ ততই বেড়ে চলেছে। হাসতে হাসতে তারা পথের গায়ে একেবারে লুটিয়ে পড়ছে, পাহাড়ী পথ আরও পিচ্ছিল হ'য়ে উঠছে। তবে একটা সুবিধে হয়েছিল। চেরাপুঞ্জীতে পৌঁছবার আগে মেঘটা গাঢ়তর হ'য়েছিল বটে, তবে এক ফোঁটাও বৃষ্টি

নামেনি। চেরাপুঞ্জী পৌঁছে কিন্তু একটা মজার ব্যাপার ঘটলো। ঝরনার ধারে চায়ের সেট্ বার ক'রে রিনি যখন চা ক'রতে উদ্যত ঠিক সেই সময় অল্প দূরে বৃষ্টি নামল। রিনি ব্যস্ত হ'য়ে সব তুলে ফেলতে যাচ্ছে হঠাৎ নরম ঠাণ্ডা খানিকটা রোদ উঠলো। চারিদিকে বৃষ্টি হ'লো, তবু রিনির পেয়ালায় এক ফোঁটাও জল পড়ল না। রিনি হঠাৎ ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে,—তুহিনের হাত ধ'রে টানাটানি ক'রছে, তুহিন কিন্তু নড়ে না, দূরে মেঘের ফাঁকে নীল সীলেট ভ্যালির দিকে তাকিয়ে আছে। পাশে অজস্রধারে মশ্‌মই জলপ্রপাত বেদনার্ত্ত কণ্ঠে ভেঙে পড়ছে। ছাই রঙের বিকাল আর ধূসর মেঘের রাশি চোখের পাতার কাছে আইড্রপের মত টল্‌টল্ ক'রছে। তুহিন তর্কের খাতিরে আধুনিক কবিতার নিন্দে করলেও নিজের কবিতা কিসে আরও আধুনিক হ'য়ে ওঠে এই নিয়ে গোপনে চিন্তা কম করে না। কিন্তু সব চিন্তার আপাততঃ অবসান ঘটলো রিনির কণ্ঠ-কাতরতার আভাসে। ছোট্ট ঝরনার পাথরগুলো ডিঙিয়ে ছুটোছুটি ক'রতে ক'রতে কেমন ক'রে সে একটু পড়ে গেছে, কাপড়ের পাড়টা অল্প ছিঁড়েছে, পায়েও বোধহয় একটু চোট লেগেছে। তুহিন কাছে যেতেই রাগতস্বরে বললে, "তোমার আর কি, বসে বসে কবিত্ব করছ—কেউ মরল কি বাঁচল দেখবার দরকার নেই!"

একটা স্বভাব তুহিন কিছুতেই ছাড়তে পারছে না—একজন রেগেছে দেখলে তাকে আরও রাগাতে তার কেমন যেন ভাল লাগে। তাই বলে, "কেউ যদি না ব'সে অকারণে

লাফালাফি ক'রে বেড়ায়, তার জন্যে ছুনিয়ার সব কবিদের ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হবে ?"

রিনি উত্তর দেয় না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। তুহিন হাত ধ'রে তুলতে গেলে নিজেই উঠে পড়ে। তারপর গাড়ীতে গিয়ে এককোণে ব'সে প'ড়ে ক্লান্তির সুরে বলে, "আর পারছি না, —ফিরবে ?"

তুহিনের এত তাড়াতাড়ি ফেরবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু রিনিকে আর রাগাতে সাহস হয় না। বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীতে উঠে রিনির পাশে বসে পড়ে।

গাড়ী চলছে। রিনি একেবারে জানলা ঘেঁষে বসেছে, আর জানলার ধারে হাত রেখে তার মধ্যে মুখ গুঁজে নীরব হয়ে আছে। হাওয়ায় তার শাড়ির আঁচলের অনেকখানি তুহিনের বুকের কাছে উড়ছে। তুহিন একবার ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়—এত কাছে বসে কোন মেয়েকে সে এতক্ষণ ধ'রে দেখবার সুযোগ পায়নি। কারণ, কয়েক মিনিট দেখার পরেই একসময় চার চোখ এক হ'য়ে যায়, তখন বাধ্য হ'য়ে বাইরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিতে হয়। মেয়েরা এ বিষয়ে বেশী লাজুক। তাই অধিকাংশ সময়েই তুহিন লক্ষ্য ক'রে দেখেছে তারা ট্রাম-বাসে উঠলে জানলার বাইরেই চাইতে ভালবাসে বেশী। রিনি কিন্তু একেবারে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে চোখটি বুজেই শুয়ে আছে—খোঁপার নিচে ফরসা অনাবৃত ঘাড়ের খানিকটা, তারপর গাঢ় নীল গরমের ব্লাউজটা, তা থেকে ছুটো নিটোল ফরসা হাত, সব মিলে বেশ একটা ছবি।

এই 'বেশ একটা' মনে হতেই তুহিন বেশ খানিকটা দূরে সরে বসে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারে না। মুষলধারে বৃষ্টি নামে, জলের ছাট্ সোজাভাবে ভেতরে ঢুকতে থাকে। রিনিকে জানলা থেকে সরিয়ে তার গায়ে ওয়াটারপ্রুফটা চাপিয়ে দেয়। রিনি কোন কথা না ব'লে নিজে ওয়াটারপ্রুফটার খানিকটা নিয়ে বাকিটা তুহিনের গায়ে জড়িয়ে দেয়; বাধা দেওয়ার উপায় নেই তাই তুহিন চুপ ক'রেই থাকে। রিনির চুলের তেলের গন্ধটা কেমন যেন পেয়ে বসছে; বাধ্য হ'য়ে তুহিন সহজভাবে কথা বলার চেষ্টা করে। পাহাড়ের গায়ে নিচের থেকে উঁচুর দিকে সারিবদ্ধ-ভাবে আলুর চাষ করা হ'য়েছে। সেইদিকে চেয়ে তুহিন বলে, "দেখ, আলুগাছগুলোকে ঠিক সবুজ গুটিপোকার মত মনে হ'চ্ছে, যেন পাহাড় টপ্‌কাবার চেষ্টা করছে অবিরত।" রিনি একবার চোখ তুলে অভিভূতের মত তুহিনের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজলো। বাইরে অর্কিড গাছের মোমের মত ফুলে আর ফার্ণের সৌখীন পাতার গা বেয়ে টস্ টস্ ক'রে বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। দেহ-সৌরভ আর তেলের গন্ধ মিশে একটা অদ্ভুত মেয়েলি আঘ্রাণকে তুহিন কিছুতেই অস্বীকার ক'রতে পারছে না। মুশ্‌কিল বেধেছে, তুহিন জীবনে কোনদিন এগুলোর বিষয় সীরিয়াসলি ভেবে দেখার সুযোগ পায়নি—না, সুযোগ পায়নি নয়, ভেবে দেখবার চেষ্টাই করেনি। অর্থাৎ তর্কের দিক থেকে তুহিন যত সীরিয়াস, মেয়েদের সম্বন্ধে তত নয়। মেয়েদের সঙ্গে সে কথাও বলেছে, কাছেও এসেছে,—তবে দূরে সরে যাওয়ার জন্যেই। কারণ ওদের ঐ মুখ-নিচু-করা, কথা-হারা

ভাবটাকে তুহিন কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তাই এমন সব অসহ্য কথা বলে যাতে কথার প্রহসন মাঝপথেই থেমে যায়, অপরপক্ষের মনে রেখে যায় কিছু উষ্ণতা। কিন্তু সে উষ্ণতা স্থায়িত্বের দিক থেকে এতই ক্ষয়িষ্ণু যে নারীমুখের লজ্জাভার মত উপলব্ধি করার আগেই মিলিয়ে যায়। ফলে তুহিনের তরল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। রিনিকে হাজার চেষ্টা ক'রেও রাগাতে না পেরে তুহিন কথা বন্ধ ক'রে বাইরের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তারপর গাছ থেকে নিঃশব্দে খসে পড়া একটি হলুদ পাতার মত একখানি নরম হাত এসে পড়েছিল তুহিনের কোলে, যা তুহিন সরিয়ে দিতে পারে নি—শুধু যাত্রাশেষে সেই হাতেই অল্প চাপ দিয়ে নেমে যাওয়ার সঙ্কেত জানাতে হয়েছিল বিনা কথায়।

ছয়

সুরকার তাঁর সুরের মাঝে তন্ময় হ'য়ে যখন বেহালার ওপর ছড়ি চালিয়ে যান, তখন হঠাৎ তার ছিঁড়ে গিয়ে তাল, লয়, সুর সব স্তব্ধ হ'য়ে গেলে তিনি নিজেই প্রথমটা অভিভূত হ'য়ে পড়েন, বুঝতে পারেন না। তুহিনেরও হ'য়েছিল ঠিক তা'ই। অর্থাৎ সে নিজেই ভাল ক'রে কিছু বোঝবার আগে ক'লকাতার উদ্দেশে গৌহাটিগামী বাসে চেপে বসেছিল। শিলং যখন তার সমস্ত জৌলুস নিয়ে অর্থাৎ প্রেমের মত করুণ ছায়া-ভরা দিন, ঘুমের মত নীলাভ শিশির-ফোঁটা, আর সোনালি কল্পনার মত

মরশুমী ফুলের রাশি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল—তখন তুহিনের মনের প্রতিটি তন্ত্রীতে যে অনুরণন জেগেছিল তাতে সে নিজেই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই অভিভূত ভাবটা নিজের কাছে যখন স্পষ্টাক্ষরে অভিদ্যোতিত হ'লো, তখনই সব সুর থেমে গেল। তুহিন তার মনের জড়তাকে ভেঙে ফেলতে চাইল নির্ম্মমভাবে। ফিরে এল একেবারে আচম্বিতে ক'লকাতার ধূলিধূসর রাজপথে। রিনির অজ্ঞাতসারে তার ডেস্কে রেখে এল একটা বিদেশী কবিতার সঙ্কলন। সে বইয়ের শেষের পাতায় একগুচ্ছ শাদা আপেলের ফুল ছিল, তার তলায় ছোট্ট ক'টি পঙ্ক্তি তুহিনের না-বলা কথাকে প্রকাশ ক'রেছিল কিছু না ব'লে—নীরবে ঃ

এ ফুল শুকিয়ে গেলে
ঝরার কথা লিখো ;
নতুন কুঁড়ির সমারোহে
আমায় তুমি ডেকো।

রিনি কবিতাটি পড়ে একটু হেসেছিল কিনা বোঝা যায়নি, তবে কাঁদেনি যে তা হলফ ক'রে বলা যায়। কারণ, রিনি অন্তত কিছুটা তুহিনকে চিনেছিল, আর জেনেছিল যা ভাল লাগে তাকে বেশীক্ষণ ভালবেসে বাসি ক'রে দিতে তুহিন চায় না। তাই ফুল চরম ফুটে ওঠার আগেই সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়—শুকিয়ে ঝ'রে পড়ার দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ নতুন পাচ্ছে ব'লেই পুরোনোকে অস্বীকার করা তুহিনের উদ্দেশ্য নয়, পুরোনোর ট্র্যাজেডি ভুলে যাওয়ার জন্যেই সে

নতুনকে আশ্রয় করে। সেইজন্যে যে মুহূর্তে তার শিলংকে ভাল লাগলো (ভাল লাগলো হয়তো আর একজনকেও), সেই মুহূর্তেই সে সব কিছুকে অস্বীকার ক'রে পালিয়ে এল ক'লকাতায়। এর পেছনে যদিও কোন পূর্ব্বপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নেই, তবু এটাকেই অনেকে রোমান্টিক মনের পলায়নীবৃত্তি ব'লে মনে করেন,— আর হয়তো একটু ঘৃণামিশ্রিত করুণার চোখেও দেখেন। কারণ, তাঁদের মতে, জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো ব্যাপারটা নেহাৎই নাকি কাপুরুষোচিত। তুহিন কিন্তু তা স্বীকার করে না। সে বলে, যারা জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায় তাদের কাছে জীবনের রূপটা একেবারে স্বচ্ছ অর্থাৎ কোন রহস্যের আবরণ নেই। সমস্ত বৈপরীত্যকে তারা দেখে শুনেই বুদ্ধিমানের মত পাশ কাটিয়ে যায় ; তাতে বীরত্ব না থাকলেও বৈচিত্র্য আছে। এই জিনিষটাকেই তুহিন অন্যরকমভাবে বলে, 'যে মাছিটা কাঁচের গেলাস ভেঙে বাইরের সবুজ পৃথিবীতে উড়ে যেতে চায় না, সে যদি ওপর দিয়ে উড়েই বাইরে পালাতে ভালবাসে, তাহলে বুঝতে হবে তার বুদ্ধির একগুঁয়েমি তো নেই-ই বরং বৈচিত্র্য আছে।' কিন্তু এসব ছাড়াও তুহিনের ক'লকাতায় আসার একটি স্থূল প্রয়োজনও ছিল। তা হ'লো এম. এ. ক্লাসের সেসান্ সুরু হ'য়ে গেছে— তুহিন এম. এ. পরীক্ষা দিক বা না-দিক, ক্লাসে সে আসবেই। কারণ, সে নিজেই বলে যে পড়াশোনা ক'রতে ভালবাসলেই যে পরীক্ষা দিতে হয় একথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে এলোমেলোভাবে পড়েই গেছে, যখন মনে ক'রেছে

তখন এক আধবার পরীক্ষার হলে ঢুকে পড়েছে। কমার্স, আর্টস্, সায়েন্স—সব কিছুই সে এক-আধ বছর পড়েছে। তবে পরীক্ষা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিবারই সে arts-এই দিয়েছে। এ বিষয়ে জিগ্যেস করলে সে বলে, 'কোন পরীক্ষার হলে না ঢুকে আমি সিনেমা হলেও ঢুকতে পারতুম—পরীক্ষার হলটা নেহাৎই একটা এ্যাক্সিডেন্ট্।' ঠিক সেইরকম এম.এ. পড়াটাও তুহিনের জীবনে একটা এ্যাক্সিডেন্ট্ ছাড়া কিছুই নয়।

সাত

যাকে নিয়ে এত হৈ চৈ, প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে এসেই সেই মেয়েটিকে দেখে তুহিন অবাক না হ'য়ে পারেনি। অবাক হওয়ার কারণও ছিল যথেষ্ট। আমরা আগেই জানি তুহিনের দীর্ঘ ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতায় সে যত মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে, তারা সবাই একটা অদ্ভুত মেয়েলি দূরত্ব নিয়ে দূরে দূরেই থেকে গেছে। খুব কাছে গিয়েও তুহিন দেখেছে বাংলাদেশের মেয়েরা বড্ড বেশী মরা; অর্থাৎ ছাইচাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি প্রাণ আছে কি নেই বোঝা শক্ত। এই শ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে এ মেয়েটির যে মোটেই আচরণগত মিল নেই তা তুহিন প্রথম দিনই বুঝেছিল। মেয়েটির অফুরন্ত কথা আর হাসি তার ভেতরের প্রাণপ্রাচুর্য্যকে এত অবাধ নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছিল যে তুহিন অল্প একটু চম্‌কে উঠেছিল। মেয়ে বন্ধুর চেয়ে তার ছেলে বন্ধুই বেশী, তবু ছেলেরা নাকি তার নাগাল পায় কম।

তাই রাগে-দুঃখে-অভিমানে ছেলে-মহলে মেয়েটিকে নিয়ে যে তুমুল হিল্লোল চলেছিল তার যেটুকু শোনালে বিদগ্ধ পাঠককে লজ্জায় দগ্ধ হ'তে হয় না সেইটুকুই শুধু বলা প্রয়োজন। তাদের ভাষার সংক্ষিপ্তসার ক'রলে এই দাঁড়ায় যে মেয়েটির নাকি ছেলে চরিয়ে বেড়ানই স্বভাব। কিন্তু থাক, সে-সব আলোচনায় বেশীদূর না এগিয়ে অন্য কথায় যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ, তুহিন নিজেই ও আলোচনাটা ঠিক পছন্দ ক'রত না। মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাটা তুহিনের বরাবরই একটু অন্যরকম। অর্থাৎ কোন মেয়েকে ও ঠিক মেয়ের মত ক'রে না দেখে ছেলের মতই দেখত, আর সেইজন্যে খুব সহজভাবে মিশে যেতে পারত। ফলে মেয়েদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার মন একেবারে যে অচেতন ছিল তা নয়, তবে অনেকটা অনাসক্ত ছিল। অন্য ছেলেরা যদিও তুহিনের এই অনাসক্তিটা নিয়ে একটু হাসাহাসি ক'রত—কেউ কেউ এটাকে ভণ্ডামিও ব'লত, তুহিন কিন্তু জানতো ভণ্ডামিটা আসলে তার নয়, ওদেরই। কারণ, যারা মেয়ে দেখলে যত বেশী রুমালে মুখ মোছে, অকারণে চশমা ঠিক করে আর বেশী বেশী সিগারেট টানে, তারা যে কোন্ স্তরের লোক তা দু'একবার দেখবার সুযোগ তুহিন পেয়েছিল সিনেমা হলের অন্ধকারে,—অচেনা পার্শ্ববর্ত্তিনীর চেয়ারের হাতলের ওপর নিজদেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থাপন করার প্রচণ্ড প্রয়াস দেখে; রাগে-দুঃখে তুহিন সেদিন ছবি দেখার অনেকখানি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। এর মানে এই নয় যে, তুহিন মেয়েদের সান্নিধ্য পছন্দ করে না, বরং ঠিক তার উল্টো—মেয়েদের

অতিসান্নিধ্য তাকে একটু অতিরিক্তই আনন্দ দেয়; কিন্তু তার মধ্যেও একটু দূরত্ব রাখতে না পারলে সে যেন পাগল হ'য়ে ওঠে। এ যেন ঠিক শীতের দিনে আগুনের পাশে বসার মত —আগুনের ঠিক পাশটিতে বসতে খুবই ভাল লাগে, কিন্তু একেবারে ভেতরে নয়—একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতেই হয়।

মেয়েটির কথায়, হাসিতে, চলার ভঙ্গিতে কি যে আছে তুহিন বুঝতে পারে না, শুধ্‌ চুরি ক'রে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। কাঁধে একটা ছিটের ঝোলা-ব্যাগ, মেরুন রঙের ব্লাউজের বুকের কাছে কাল রঙের শেফার্স পেন, হাতে সরু সরু চারগাছা চুড়ি, গলায় ইমিটেসান পার্লের মালা, কখন কখন পিঠের ওপর কাল ট্যাস্‌ল্‌ দিয়ে বাঁধা একটা মোটা বেণী,—সব মিলে তুহিনের চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠতো। কিন্তু মেয়েটির নিজস্ব হাসি আর কথা বলার ভঙ্গিটি ছাড়া সব কিছুই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যেত—কোন কোন দিন বইয়ের ঝোলার বদলে হাতে থাকত ছাই রঙের একটা লম্বা ফাইল, গলায় সোনার হার, শুভ্র পায়ে একটা সরু আল্‌তা রঙের চটির ঘের।

কারুর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে তুহিনকে কখনও বেগ পেতে হয়নি। তুহিন নিজেও জানে কথা বলার একটা অনিঃশেষ শক্তি নিয়ে সে জন্মেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙ করার মত একটি একটি ক'রে কথার বৃত্ত তৈরী ক'রে তুহিন সেগুলোর দিকে ফিরে ফিরে চাইত। অর্থাৎ নিজের বাক্‌শক্তি সম্বন্ধে তুহিন খুব বেশী রকমই সচেতন ছিল। কিন্তু এ মেয়েটির বেলায় তুহিনের সব শক্তিই পরাজয় মানল। কিছুতেই আলাপ হয় না,

অথচ দুজনেই দুজনের বেশ পরিচিত। ক্লাশের আশেপাশে, লাইব্রেরীর দরজায় ছাড়াও এক বাসেই দুজনে একাধিকবার ফিরেছে, চোখে চোখ পড়ে গেলে দুজনেই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। এত ভিড়ের মাঝেও বাস জার্নিটা তুহিনের এত ভাল লাগত কেন এ চিন্তাটা সে সব সময়েই এড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ যখন চাইত, দেখত আর এক জোড়া কালো চোখের পাতাও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আনত হয়ে গেল, হয়তো ধরা পড়ার ভয়ে! ওর নাম তুহিন এখনও জানতে পারেনি। লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কতবার তুহিন ওর সেই লম্বা ছাইরঙের ফাইলের ওপর লেখা নামটা পড়বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ও যেন ইচ্ছে ক'রেই নাম-লেখা জায়গাটার ওপর হাত দিয়ে ধরে থাকে। হয়তো মুখে সেই সময় একটু চাপা হাসির ভাবও দেখেছে,—কিন্তু সবই এক লহমার মধ্যে। তুহিনও দুষ্টুমির দিকে কম ছিল না। সে জানে ছুটির পরে মেয়েটির নেমে আসতে সব চেয়ে দেরী হয়—তাই সেও চুপচাপ সিঁড়ির নিচে বহুবার পড়া নোটিশ বোর্ডটাকে আবার মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকে। সব ছেলেরা একবার ক'রে হাত ধ'রে টানবার চেষ্টা করে, তুহিন কথার বেড়ায় সবাইকেই দূরে সরিয়ে দেয়। তবে এ সময়টায় তুহিন এত বেশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যে তার কথাবার্ত্তায় ছেলেরা না হোক মেয়েরা অন্তত বুঝতে পারে যে, তুহিন ভাবছে এক কথা আর বলছে আর এক। এই সুযোগে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, তুহিন আর সেই মেয়েটি দুজনে দুটি

সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়ে এম. এ. পড়তে এসেছে, সুতরাং দুজনের রোজ একই সঙ্গে ছুটি হওয়া সম্ভব ছিল না। হপ্তায় মাত্র তিনটি দিন তুহিন চেষ্টা ক'রলে মেয়েটির সঙ্গে একযোগে ফিরতে পারত। তাই এই তিনটি দিনে তুহিন ছুটির পরে একটু বেশী রকম আনমনা হ'য়ে পড়ত—সিঁড়ির তলার নোটিশ-বোর্ডের কাছে, গেটের ধারে, প্রাচীরপত্রের সামনে সে অযথা ঘুরে বেড়াত। তারপর আড়চোখের বাঁকা দৃষ্টিতে কোন চেনা চলন চোখে পড়লে সে বেশ একটু দ্রুত হেঁটে বাস-ষ্টপে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত—যেন কাউকেই সে লক্ষ্য করেনি, জানেনা কিছুই। সচেতন মনের এইসব ছেলেমানুষির কথা চিন্তা ক'রে পরে তুহিনের হাসি পেয়েছে ছোট ছেলের মত; কিন্তু বর্ত্তমানকে সে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সপ্তাহের সেই বিশেষ দিনগুলিতে বাস-ষ্টপে তাকে অপেক্ষা করতেই হয়। তারপর সে আসে—রোদটা আড়াল করবার জন্যে কখন কখন সেই পরিচিত ফাইলটা কপালের কাছে ধ'রে, রাস্তাটা ক্রশ্ করার সময় সেটা দুলতে থাকে, মুখের ওপর আলোছায়া কাঁপে, আর ঠিক ও ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আর একজন কিছুতেই নিজের চোখদুটোকে শাসন করতে পারে না। বাসের পথটুকু বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। তুহিনকেই আগে নামতে হয়, তাই সে জানতে পারে না যে ও কোথায় থাকে। তবে বাসটার গতি দক্ষিণপাড়ায় ব'লে অনুমান করতে পারে যে মেয়েটি 'দক্ষিণী'। তুহিনের বাড়ী যদিও দক্ষিণে, তবু ঠিক বালিগঞ্জে নয়। কিন্তু যে শুধু কথা ভালবাসে, কথা সাজিয়ে কবিতা লিখতে আরও ভালবাসে,

তার পক্ষে কিছু না বলে নিছক বাস থেকে ওঠা-নামা করা বড়ই কষ্টকর—বিশেষ ক'রে কথা বলতে না পেরে মনের কবিতার ভিড় যার রুদ্ধ হ'য়ে আছে। তাই তুহিন ক্রমশঃই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছিল।

আট

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি—যে তিনটি বারের জন্যে তুহিন অপেক্ষা করত অধীর আগ্রহে, তারাও নিরাশ করল তুহিনকে একেবারে নিরপেক্ষভাবে। বাস-ষ্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাস থামিয়ে আর না-থামিয়ে বহু '2-2A'এর ভিড় কলেজ ষ্ট্রীটের বুকের ওপর দিয়ে চলে গেল, রেখে গেল পোড়া পেট্রলের গন্ধ মেশা ধোঁয়া,—হয়তো মাঝে মাঝে বৃষ্টির জলজমা কাদারও একটু ছিটেফোঁটা। তুহিনের পা অবধি ওয়াটারপ্রুফ—তাই সে নির্ব্বিকার। কিন্তু বহুক্ষণ অন্য কোন চেনা সাকারের সন্ধান না পেয়ে একসময় বাসে উঠতেই হয়। বাড়ীতে এসেই শুয়ে পড়ে—মাথার কাছে জানলার গায়ে কালো কবিতার মত মেঘের ভিড় জমা হয়। বৌদির কাছে খাবারের বদলে তুহিন কবিতার খাতাটা চেয়ে নেয়। একটু রাগ, একটু অভিমান, চোখের একটু ভারী দৃষ্টি নীরবে এড়িয়ে তুহিন খাতার পাতাটা কালির আঁচড়ে ভ'রে তোলে—

বৃষ্টির ফোঁটার রঙে
মনের পটটা কালো ;
অপেক্ষা ক'রেছি—আগ্রহে, আবেশে।

সময় এসেছে···
আবার গিয়েছে চলে—
তবু তা হয়নি বলা।

প্রাণটা আমার
পুরোনো লণ্ঠন যেন—
আলো যত, তার চেয়ে
ধোঁয়া তার বেশী—
তাই কথা নেই।

নগরীর কোলাহলে দেখা—
পেট্রলের পোড়াগন্ধ, ভিড়—
তারি মাঝে
সুপুরি পাতার মত তোমার চোখের পাতা কাঁপে

সন্ধ্যা এল—
তোমার শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে
ধূপের ধোঁয়ার রঙ জমে।
সময় এল—
তবু তা হ'লো না বলা।

এবার হয়তো শেষ দেখা
বুনো কল্‌মীর নীল
আষাঢ়ে আকাশে।—
দুজনেই যাত্রী মোরা।

সরু সরু ইস্পাতের পথে
দুপুরের ট্রাম চলে যায়—
ঠেলাগাড়ী···রিক্সার ঠুং ঠুং,
মানুষের এলোমেলো কথা।
তুমি ভেসে গেলে
জীবনের অন্য কোন স্রোতে,
আমি তার বিপরীত দিকে।
যে কথা হ'লো না বলা
সে কথার বুঝি শেষ নেই।

কথার শেষ নেই সত্যি ; কিন্তু তবু তুহিনকে কলেজ যেতে হয়—নির্দ্দিষ্ট দিনে বাস-ষ্টপেও অপেক্ষা করতে হয়।

হঠাৎ এক দিনের ব্যাপারে তুহিন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, ছড়িয়ে-পড়া মনটাকে পাতলা রাংতার মত মুড়ে ছোট ক'রে নিল—ওপরের ঝিকিমিকিটা শুধু র'য়ে গেল, ভেতরটা অসংখ্য ভাঁজে ভাঁজে ক্ষুদ্র থেকে ক্রমে ক্ষুদ্রতম হ'য়ে গেল। সেদিন তুহিনকে বাস-ষ্টপে দেখেই মেয়েটি সামনের এক বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়লো, তারপর তুহিনের বাসে চাপার আগে পর্য্যন্ত সে-ই দোকানেই এলোমেলো বই ঘাঁটলো; কিন্তু তুহিনকে নিয়ে বাসটা যখন ছেড়ে দিল তখন একবার তার চকিত দৃষ্টিটা ছাই-রঙা ফাইলের ফাঁক থেকে ছুঁড়ে মারল সেই চলন্ত বাসটায়। তুহিনের গায়ে লেগেছিল কিনা সে খবর জানা যায় না। তবে ঠিক দুদিন পরেই যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা অতি আকস্মিক হ'লেও অনভিপ্রেত ছিল না।

সেদিন—বারটা মঙ্গল, বৃহস্পতি-শনির দোষ-মুক্ত—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্যে গেটের বাইরে এসে তুহিন অবাক হ'য়ে গেল সেই মেয়েটিকে অপেক্ষা করতে দেখে। আগুন রঙের শাড়ি আর ব্লাউজটা ওকে এত দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে চোখে না পড়ে উপায় নেই, তবু না দেখার ভান ক'রে তুহিন যেই ষ্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অমনি একটা বাস এসে দাঁড়াল। তুহিন ভাবলে আজ ওর সঙ্গে কিছুতেই এক বাসে উঠবে না। তাই দাঁড়িয়ে রইল পরের বাসের অপেক্ষায়; কিন্তু যখন দেখল মেয়েটিও উঠতে নারাজ, তখন একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে দরজার হাতলটা চেপে ধরল, আর সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেল, "তাড়াতাড়ি উঠুন, আমি পড়ে যাব যে।"

ভেতরে গিয়ে সব ক'টা লেডিস্ সীট উপেক্ষা ক'রে এবার মেয়েটি বসল গিয়ে ছোট একটা জেণ্ট্‌স সীটের জানলার কাছে, তুহিনকে নির্দ্দেশ দিল পাশে বসতে। তারপর, সে-ই প্রথম মুখ খুলল "নিজেও উঠবেন না, অন্যকেও উঠতে দেবেন না—আপনি তো আচ্ছা লোক—"

"সে শিক্ষা তো আপনার কাছেই পাওয়া"—উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়েই তুহিন সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

"আমার কাছে পাওয়া? কি বলছেন? আপনি একটু —মানে, জানেন তো মেয়েরা সময় বিশেষে একটু কম বোঝে—"

"না, এখানে দোষটা আমারই—কোন কিছুকে সংহত করলে তার গভীরতাকেই বাড়িয়ে দেওয়া হয়; এখন কিছু ব্যাপ্তির

প্রয়োজন। অর্থাৎ আমি বলছিলাম, নিজেও বাসে উঠলেন না আর অপরকে দাঁড় করিয়ে বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়লেন—এ ঘটনাটা তো আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম। তাই বলছিলাম কাজটা আমার হ'লেও প্রেরণাটা আপনার।"

"কিন্তু আমি তো দরজা আগলে দাঁড়াই নি—"

তুহিন সঙ্গে সঙ্গেই জুড়ে দেয়, "দেখুন ঐ 'দরজা' শব্দটার একাধিক সাহিত্যে একাধিক ব্যাখ্যা আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে মাঝে মাঝে ওটাকে মানসিক ব'লেও ধরা হ'য়েছে, সুতরাং এ আলোচনা আসুন ঘুরিয়ে নিই অন্য কোন দিকে। এই যেমন ধরুন আপনার কাপড়ের ঝোলা-ব্যাগটা কাঁধ থেকে ঝুলছে, গলায় সোনার হারটা দুলছে, শেফার্সের ক্লিপে আলোটা ঠিক্‌রে পড়ছে, মেরুন ব্লাউজ আর শাড়িতে যেন আগুন ধরে গেছে—এইসব মিলে যে ছোট্ট একটা ছবি গড়ে উঠেছে তাকে হঠাৎ ভেঙে দেওয়ার অধিকার আপনার নিজেরও নেই বোধহয়। অর্থাৎ বাসের তুমুল ভিড়ে এই অনেকখানি রঙ দেওয়া একটুখানি ছবি দেখেই কেউ যদি আনন্দ পায়, তাকে অকারণে বঞ্চিত করা কি কখন উচিত ?"

তুহিনের প্রশ্নটার সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে একটু হেসে মেয়েটি ব'লে উঠল, "এক নিঃশ্বাসে এক-তরফা কথা বলে যাওয়ার একটা সুবিধে এই যে, অন্যের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যায়। আর আপনার কথাগুলোও ছোট ছোট পঙ্‌ক্তির মধ্যে সাজিয়ে নিলে, তাড়াতাড়ি কবিতা করে নিতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না। কিন্তু আপনারা কবি বলেই বোধহয় লজিকে

ভুল করেন। কারণ, আপনার সঙ্গে রোজ হট্ হট্ ক'রে এক বাসে উঠে পড়ব তারপর আপনি একদিন ফট্ ক'রে বলে বসবেন,—'আচ্ছা বেহায়া মেয়ে তো! চেনা নেই, জানা নেই, রোজ রোজ আমার সঙ্গে এক বাসে উঠে পড়ে'—"

"কিন্তু আমার চোখ দেখেই তো আপনার মনের লজিকের বোঝা উচিত ছিল যে, আমি ওকথা কখনই বলতে পারি না। এতেও যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তো আজ স্পষ্ট বলে রাখছি যে আপনার জন্যে বাস-ষ্টপে আমি হপ্তায় তিনটে দিন অন্তত অপেক্ষা করবই, সুতরাং দয়া ক'রে সেইসময় কোন বইওলাকে বড়লোক করবেন না।"

তুহিনের কথা বলার সুরে মেয়েটি না হেসে পারে না। কিন্তু একটু লজ্জাও পায় বোধ হয়, তাই বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে।

বাইরে বৃষ্টিটা থেমে গেছে। সিগারেট ধরাবার আগে হাতের মধ্যে দেশলাই জ্বাললে যেমন একঝলক আগুনের লালচে আভা আঙুলের ফাঁকে চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তেমনি অস্তমিত সূর্য্যের একটুখানি রক্তাভ আলো ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। একটু ধূসর আভা শুধু রেখে গেল আকাশের গায়ে, আর তুহিনের পাশে বসা মেয়েটির গোলাপী গালে। তুহিন একটু আনমনা হ'য়ে সেইদিকেই তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ মেয়েটির কথায় চমক ভাঙল, "এত কাছে ব'সে এত নিবিড় ক'রে দেখলে আপনারা কবি মানুষ আমার রূপের কত খুঁত ধ'রে ফেলবেন—"

"আপনার বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে দু'-দুটো অভিযোগ আছে। প্রথমটি হ'লো—আমি কবি কিনা কে বলেছে আপনাকে? দ্বিতীয়টি হ'লো—আপনার রূপের কোন খুঁত আছে কিনা কি ক'রে জানলেন?"

মেয়েটি একটু হেসেই জবাব দেয়, "দুটোর উত্তরই খুব সোজা। একটু ভাবলে আপনিও দিতে পারতেন। প্রথমটি জানতে পারলাম আপনার কথায়-বার্ত্তায়, এমনকি বুক-পকেট থেকে উঁচু-হ'য়ে-ওঠা কয়েকটা আঁকা-বাঁকা পঙ্‌ক্তি তার প্রমাণ দিচ্ছে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হ'লো, দুনিয়ার এমন কোন মেয়েকে আমার জানা নেই যে তার মুখটা প্রকৃতই কেমন তা জানে না। শুধু জানাই নয়, তারা তা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে দিনের অনেকখানি সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবক্ষয় করাকে মোটেই অপচয় মনে করে না। আমিও তো তাদেরই দলে, সুতরাং জানি যে আমার মুখখানা মোটেই নিখুঁত নয়। যেমন ধরুন, আমার এই অদ্ভুত নাকটা দেখে কেউ আমাকে বাঙ্গালী বলে বিশ্বাসই করতে চায় না। তারা বলে—"

"তারা যাই বলুক, আমি বলি ঐটেই আপনার বিশেষত্ব। সুন্দরটা একেবারে নিখুঁত হ'লে তা বড় অসহ্য লাগে, খালি মনে হয় এই বুঝি নষ্ট হয়ে যায়। নিখুঁত নতুন বিছানার মত—শুতেও কষ্ট হয় পাছে নোংরা হয়ে যায়। ব্যবহারিক জীবনে সুন্দরের সত্যিই কোন দাম নেই। তারপর—"

"তারপরটা না হয় কাল বলবেন। আপনি তো এলগিন

রোডেই রোজ নামেন দেখি, এইটেই কিন্তু এলগিন রোডের ষ্টপেজ।”

“ওঃ, একদম ভুলে গেছি।”

তুহিন তাড়াতাড়ি সীট্ থেকে উঠে পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে তুহিনের খালি সীট্টায় বসতে বসতে বলে, “সারা, কতক্ষণ থেকে ভাবছি তুই আমার দিকে চাইবি,—তোদের গল্প আর থামে না—”

তুহিন বাস থেকে নেমে গেল, কানের কাছে খালি একটি নাম গুঞ্জন ক'রে ফিরতে লাগল—সারা, সারা, সারা। সহসা কোন নরম হাতের স্পর্শে দেহে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, নামের স্পর্শেও ঠিক তাই। তুহিন সেদিন কত খাতা আর বইয়ে যে ঐ দুটি অক্ষরের 'সারা' নামটি লিখেছিল তার সংখ্যা নেই। ছোট ছেলেরা যেমন সরবতের গেলাসে 'সাকার' দিয়ে বুড়বুড়ি কাটে, তুহিন সেদিন ঠিক তেমনি ক'রে তার হৃদয়ের পূর্ণপাত্রে 'সারা' নামটি দিয়ে অসংখ্য বুদ্বুদ কেটেছিল—কত রঙিন বুদ্বুদ। গান থেমে যাওয়ার পরেও যে নরম সুর তার ভিজে ভিজে হাতে হৃদয়কে আঁকড়ে ধরে, এ নামের সুরও তেমনি একটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা হাতে তুহিনের তপ্ত হৃদয়কে স্পর্শ করে গেল। যেন জ্বরভরা কপালে জলপটি—তুহিনের অলসিত চোখ দুটো বুজে আসে আবেশে।

নয়

সারাকে সুন্দরী বললে সারা নিজেই হাসবে সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ ফরসা চামড়ার ওপর চোখ-মুখ-নাক-কান অতি নিখুঁতভাবে সেলাই-করা যে বস্তুটিকে আমরা সুন্দরী আখ্যা দিয়েছি, তার মধ্যে সারা কিছুতেই পড়তে পারে না সত্যি। তবে তার সমস্ত মুখখানার মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছিল যার জন্যে তেলে-জলে-রোদে সব সময়ই তাকে অদ্ভুত মানাত।

সেদিন কবিতার বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তুহিন একজায়গায় এসে না থেমে পারেনি। কবিতাটা পড়ে তার মনে হ'লো পাশ্চাত্যের সেই কবি যেন সারাকে দেখেই কবিতাটি লেখেন, কবিতাটা অনেকটা এইরকম—

"She is not fair to outward view
As many maidens be,
Her loveliness I never knew
Until she looked on me.

O then I saw her eye was bright,
A well of love, a spring of light···
······Her very frowns are fairer far
Than smiles of other maidens are."

কবিতাটা তুহিনের এত ভাল লেগেছিল যে, এর একটা বাংলা অনুবাদ তার কলম দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এসেছিল—

এক চাওয়াতে দেখলে পরে সুন্দরী সে নয়,—
সুন্দরীদের দলছাড়া সেই মেয়ে ;
তার মিষ্টি মুখটি মধুর মনে হয়
হাসে যখন আমার পানে চেয়ে।
তার কাজল-কালো উজল তারার মাঝে
দেখতে পেলেম প্রেমের ধারা, আলোর ঝর্না রাজে।
······দুষ্টু চোখের কটাক্ষ তার—সেও যেন গো ভাল,
অন্য যত সুন্দরীদের হাসির ছটাও কালো॥

তাছাড়া সারা যখন কথা বলত তখন তার মুখের প্রতিটি রেখাই যেন মুখর হয়ে উঠতো। তার কথা বলার ভঙ্গি আর গলার স্বরটাও ছিল এত আশ্চর্য্যরকম আলাদা যে, অনেক মেয়ের ভিড়ের থেকেও সারাকে খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করা যেত। যদিও সারা কথা একটু তাড়াতাড়িই বলত তবু বুঝে নিতেও অন্যের দেরী হ'তো না। তাই সেদিন বাস থেকে একেবারে নামবার সময় হ'লেও তুহিন সারার কথায় ঠিকই বুঝেছিল যে, আজকে সন্ধ্যার আসরে গান শুনতে সারাও আসছে।

এদেশের 'আধুনিক আর্টিষ্টরা' বরাবর তাঁদের সনাতন ধর্ম্ম পালন করে আসছেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে এসে। তাঁরা হয়তো জানেন যে, সুস্থ মেজাজে তাঁদের গান-বাজনা ধৈর্য্য ধরে শোনবার মত শ্রোতা এদেশে অতি অল্পই আছে—কি নেই। তাই তাঁরা অধিক বিলম্বে এসে আগেই শ্রোতাদের

ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়ে অস্থির ক'রে তোলেন এবং যখন বোঝেন মন-মেজাজ বিগড়ে শ্রোতাদের মানসিক সুস্থতা আর একেবারেই নেই, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁরা হাজির হন আর খুব হাল্‌কা হিন্দী সিনেমার ছুয়েকটা গান গেয়ে বা বাজিয়ে একদল বিকারগ্রস্ত লোকের হাততালি পকেটস্থ ক'রে সালঙ্কারে শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে ধীরে ধীরে নেপথ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তুহিন এর সব কিছুই বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু তবু এর ব্যতিক্রম দেখবার জন্যে একাধিকবার সে ঐসব আসরে এসেছে—তবে আর্টিষ্টদের স্বজাতি বলেই সেও আসে একটু দেরীতে। আজও তাই বেশ একটু বিলম্বে পৌঁছে গেটের পাশেই সারাকে অপেক্ষা করতে দেখে বুঝেছিল তার ভাগ্যে ছঃখ আছেই। ইতিমধ্যে বাসে ক'রে তারা ছজনে এখান-ওখান এতবার যাতায়াত করেছে যে প্রতিদিনের মাইলগুলো যোগ দিলে ডানদিকের শূন্যসংখ্যা গুণে শেষ করতে একটু বিলম্ব হ'তো; তাই আলাপটাও তাদের একটু তাড়াতাড়িই ইন্‌ফিনিটিতে পৌঁছেছিল। সেইজন্যে সারার সঙ্গে কথা বলতে তুহিনের আর আজকাল এতটুকুও জড়তা ছিল না। তাই সন্ধ্যে থেকে গেটের-পাশে-অপেক্ষমাণা সারার মুখের মধুবর্ষণ সুরু হওয়ার আগেই তুহিন আচম্বিতে আরম্ভ করে, "উঃ সারা, তুমিও এত সাজতে জান?"

সারা রেগে গিয়েছিল খুবই, কিন্তু তার রাগটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই তুহিন যে হঠাৎ কথা পেড়ে বসল এই ব্যাপারটা চিন্তা ক'রে সারার হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। তার

রাগের সঙ্গে হাসি-মেশা মুখটা দেখে তুহিন হয়তো আরও কত কি ব'লে চলতো। কিন্তু সারা একটু গম্ভীর হ'য়ে ঠিক তুহিনের সুরেই পাল্টা প্রশ্ন করে,—"তুহিন, তুমি এত ঘুমুতে পার ?"

"ঐ ঘুমই তো আমায় মেরেছে। তা না হ'লে দেখতে তোমার চেয়ে কত বেশী সেজে আসতাম।"

সারা সত্যিই, সেজেছিল, তবে রোজকার মত নয়, একটু আলাদা। তাই সাজটা চোখে অল্প পড়ে। অর্থাৎ রোজ সে রঙিন শাড়ি-ব্লাউজ পরে আসত, আজ এসেছে সাদা নেটের কাজ করা ব্লাউজ আর সাদা শিফোন প'রে, মাথার খোঁপায় আছে বেলের কুঁড়ির বেড়ি। সেদিক থেকে চোখটা ফিরিয়ে, সারার হাত ধ'রে যে ছোট্ট মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল তার দিকে চেয়ে তুহিন আবার সুরু করে, "দিদি তোমায় একটুও ভালবাসে না। দেখো, দিদি সেজেছে, তোমাকে একটুও সাজিয়ে দেয়নি।"

মেয়েটি একবার বড় বড় চোখে সারার মুখের দিকে তাকায় তারপর তুহিনকে উদ্দেশ ক'রে বলে, "ওর নাম দিদি নয়, জাপানীদি'—ও আমায় খুব ভালবাসে, তুমি জান না।"

সারা তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, "দুষ্টু মেয়ে, তোমায় আমি ছাই ভালবাসি। বলেছি না, বাইরে এলে আমাকে একদম জাপানীদি' বলবে না ?"

তুহিন ততক্ষণে হো হো ক'রে হাসতে আরম্ভ করেছে। সারার রাগ দেখে মেয়েটি তার হাত ছেড়ে তুহিনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলে, "ওর নামটা কি ভুলে গেছি—কি নাম বল না গো ?"

তুহিন ওর মাথার রিবন্‌টা ঠিক করতে করতে বলে, "ও তোমার আমার সকলের ওপর রাগ করে, সেইজন্য ওর নাম হ'লো, 'দুষ্টু সারা'। কিন্তু তোমার নামটা কি বললে না তো?"

উত্তর দেবার আগেই সারা বেশ রাগত স্বরেই বলে, "তুমি এলে দেরীতে; তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিমার সঙ্গে গল্প করতে থাক, আর আমাদের বসে কাজ নেই।"

সারা রেগে গেছে বুঝে তুহিন ভারি একটা মজা করে। সে চুপচাপ সারার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জিগ্যেস ক'রলে বলে, "রাগলে তোমার মুখটা আরও সুন্দর লাগে—তাই দেখছি।" ওর নির্ব্বিকার উত্তরে সারার রাগ মুহূর্ত্তে জল হয়ে যায়। তবু রাগের ভান ক'রে সে পিছু ফিরে দাঁড়ায়। কিন্তু তাতেও তুহিন দমে না, বলে, "জানি তুমি মাথায় ফুল দিয়েছ, সেটা পিছু ফিরে না দেখালেও চলতো।" এবার আর সারা হাসি চাপার ব্যর্থ চেষ্টা না ক'রে সজোরেই হেসে ওঠে আর বলে, "এবার থেকে আমি রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব তোমার ঐ ভেবেচিন্তে কথা বলার ক্ষমতাটা যেন তিনি কেড়ে নেন—"

"ভেবেচিন্তে কথা বলার সময় আর তোমরা দিচ্ছ কই? সে যাক্‌, কিন্তু আমার বাক্‌শক্তি বিধাতা কেড়ে নেওয়ার চেয়ে আরও বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে, তোমাদের জায়গা কেড়ে নেবে অন্যে। সুতরাং…"

সারাদের বসিয়ে তুহিন যখন নিজে বসতে এল পেছন দিকে তখন সত্যিই বসার কোন উপায় নেই। তবে তুহিন ওখানে একা নয়। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাওয়ায় কেউ তারা সতরঞ্চিতে না

বসে একটা নতুন হাই-বেঞ্চ্ ভেতরে আনল। আর পেছনে কেউ ছিল না ব'লে তার ওপর বসতে কেউ ওদের বাধাও দিল না। এখান থেকে সারার বেলকুঁড়ির ঘের-দেওয়া মাথাটা বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ে, তবে সারাও যে ঘুরে একসময় তুহিনকে দেখে ফেলেছে তা বোঝা গেল বেশ খানিক পরে। তখন আসর বেশ জমে গিয়েছে, হঠাৎ তুহিনের চোখে পড়ল সারা উঠে পড়ছে। এই সময়ে হঠাৎ সারাকে উঠে পড়তে দেখে মেয়েমহলে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে সারাকে নিশ্চল ক'রে দিতে পারেনি—সে নির্ব্বিকার ভাবেই বেরিয়ে এসেছিল। তুহিনও না-দেখার ভান ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, তবু চোখের কোণ দিয়ে একটা সাদা শাড়িকে বার বার দরজার পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে দেখেছে। শেষে সারা যখন লিমার হাত ধ'রে সত্যিই বেরিয়ে চ'লে গেল, তখন ব'সে থাকা তুহিনের পক্ষেও অসম্ভব হ'য়ে পড়ল। কিন্তু একটা ছেলের সঙ্গে দেখা করার অজুহাতে তুহিন যখন বেরিয়ে এল তখন তার বন্ধুরা রাগ করেছিল সত্যিই, আবার তার সঙ্গে একটু হেসেও ছিল। যদিও সে হাসি তুহিনের চোখে পড়েনি ; কারণ, তাহলে একটা স্পষ্ট উত্তর সে দিতই। ভিড় ঠেলে বাইরে আসতে একটু দেরী হ'য়ে গেছে, তাই তুহিন ভাবছিল সারা বোধহয় এতক্ষণ বাসে উঠে পড়েছে। সত্যিই সারা বাসে উঠেই পড়েছিল, তবে তুহিন যে মুহূর্ত্তে গেটের বাইরে পা দিল সেই মুহূর্ত্তেই বাসটা ষ্টার্ট দিল। জানলার পাশেই সারাকে ব'সে থাকতে দেখে তুহিন ছুটে রাস্তা ক্রশ্ ক'রে

যখন বাসের হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরেছে তখন বাসটার গতি বেশ বেড়ে গিয়েছে। উঠতে গিয়ে একটা খোঁচা লেগে তুহিনের চটির ষ্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে পায়ের আঙুলটা কেটে গেল। লেগেছে এটুকু তুহিনও বুঝেছিল, তবে রক্ত বেরিয়েছে কিনা সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। সারার কথায় যখন সে পায়ের দিকে চাইল তখন চটিটা ভিজে চট্‌চট্‌ করছে। সারাও বেশ জানতো যে তুহিন ঐ অবস্থায় বাড়ি ফিরবে তবু পায়ে কিছুই বাঁধবে না, তাই একসময় ইচ্ছে করেই সে হাতের রুমালটা রক্তের ওপর ফেলে দিল আর নিরাসক্ত কণ্ঠে ব'লল, "পড়ে গেল! যাক্‌গে, যখন পড়েই গেল তখন ওটা আঙুলে বেঁধেই নাও। রক্ত-লাগা রুমাল আর আমি নিচ্ছি না।" কিন্তু তুহিনের ভাগ্যে আরও কিছু ছিল। তাই এই রাতে সারাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই সারার বাড়ি অবধি তাকে ছুটতে হ'য়েছিল।

আইভিলতা-দেওয়া সারাদের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা বেশ লেগেছিল তুহিনের। রাস্তার দিকে কালো রেলিঙ্‌-ঘেরা একটুক্‌রো বারান্দা, তার সঙ্গেই সারার ঘর,—এখান থেকে লেক্‌টা বেশ চোখে পড়ে। মোড়ের মাথায় একটা লাল কুঁড়িভরা কৃষ্ণচূড়া গাছ, ঠিক তার তলায়ই বাস-ষ্টপেজ,—সারা ওখান থেকে রোজ বাস ধরে। তার সেই কাঁধে বইয়ের ঝোলা আর বুকে শেফার্স পেন গোঁজা ছবিটা একবার তুহিনের কল্পনাকে ছুঁয়ে গেল। সারার বাবা প্রভাসবাবু ইকনমিক্সের রিটায়ার্ড প্রফেসার; কিন্তু একটা দার্শনিক-সুলভ প্রশান্তি তাঁকে অর্থ-নীতির জগৎ থেকে অনেক দূরে ঠেলে রেখেছে। তবে সব

নীতিকেই ছাড়িয়ে গেছে তাঁর মাতৃহারা সারার ওপর স্নেহাতিশয্য। লিমা প্রভাসবাবুর এক দূরসম্পর্কের ভায়ের মেয়ে, মাঝে মাঝে আসে। সারা সম্পর্কে এটুকু পরিচয় না দিলে তুহিনের নিজেরই হয়তো সারাকে চিনতে অসুবিধে হ'তো, কিন্তু এর বেশী পরিচয় দেওয়া সারা-তুহিন কেউই পছন্দ করত না। কারণ, তুহিনের ভাষায় 'প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব পরিচয়ের প্রতীক। —এ পরিচয় ছাড়িয়ে আরও পরিচয়ের প্রয়োজন হয় একমাত্র দীর্ঘ-উপন্যাস লেখকদের।' তুহিন এ সম্বন্ধে এত বেশী সতর্ক ছিল যে তার নিজের দাদা-বৌদি,—যাঁদের কাছে সে মানুষ,—তাঁদের সম্বন্ধেও কোনদিন সে সারাকে খুঁটিয়ে কিছু জানায়নি। তবে প্রভাসবাবুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে সারাকে সে প্রায়ই বাবার আদুরে মেয়ে ব'লে রাগাত। বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সত্যিই প্রভাসবাবু নিজের হাতে মেয়ের সব আবদার পূরণ করতেন অনলস ভাবে। সেদিন রাত্রে তুহিনের সঙ্গে তিনি যত কথা বলেছিলেন তার অধিকাংশই সারা সম্বন্ধীয়; তবে তা শুনতে খারাপ লাগেনি। তার কারণ, সারা নিজেই এক এক সময় সবকিছুকে অস্বীকার ক'রে উড়িয়ে দিচ্ছিল একটা বাচ্চা মেয়ের মত—"বাবা, তুমি বুড়ো হ'য়ে সব ভুলে গেছ। আমি আবার কখন লেকের ধারে চিনেবাদাম আনতে গিয়ে হারিয়ে গেলুম?······বারান্দাতে জল জমলে আমি পা ডুবিয়ে বসে থাকতুম?—ছি ছি, কি যে বল তুমি বাবা!" সারাকে সেদিন মনেই হয়নি কোন এম. এ.-পড়া মেয়ে;—অবশ্য কোনদিনই তাকে তা মনে হয় না। কিন্তু সেদিন সারাকে একটু বেশীরকম

ছেলেমানুষ মনে হ'য়েছিল—যেন সমুদ্রের ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের মত। শাদা ফেনাভরা ঢেউগুলো যখন আছড়ে লুটিয়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে সোনালি বালির গায়ে ভেসে যায়, তখন মনে হয় সমুদ্রেরও বুঝি গভীরতা নেই—সেও বুঝি এমনিই উচ্ছ্বাসপ্রবণ, সরল, প্রাণচঞ্চল।

সেদিন বেশ একটু রাতেই তুহিন বাড়ি ফিরেছিল। প্রভাসবাবু আমন্ত্রণ জানালেও সারা একবারও তুহিনকে আবার আসতে বলেনি। তুহিনের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে সে অন্ততঃ কিছুটা তাকে চিনেছিল; জানত তুহিনকে বেশী কাছে টানতে গেলে সে হয়তো দূরে সরে যাবে। কারণ, ওর মত রোমান্টিক মনের ধর্ম্মই এই—ওরা কোথাও পূর্ণতা খুঁজে পায় না। হয়তো তুহিন একদিন ভেবে ব'সবে সারা তাকে ভালবাসে—সারা তাকে চায়। সেই মুহূর্ত্তে সারার সবকিছু ওর চোখে কুশ্রী ঠেকবে। তখন মনে হবে কথা বলতে বলতে সারার চোখমুখ যে অত নড়ে, তা যেন সুন্দর দেখাবে ব'লে সারা ইচ্ছে ক'রেই নাড়ায়—শুধু তুহিনের ভাল লাগবে ব'লে। তখন সারার কথার উচ্ছ্বাসকে মনে হবে—সারা যেন জোর ক'রে ব'কছে, যেন কথা ফুরিয়ে গেলে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়বে ব'লেই ও অকারণে কথার জের টেনে চলেছে। সে সব কথা ভেবে সারার মত প্রাণভরা মেয়েরও মাঝে মাঝে ভয় করে। ভেসে-চলা মেঘের কালোর মত ওর ফরসা মুখখানাতে পলকের জন্যে কিসের ছায়া পড়ে। প্রভাস-বাবু জিগ্যেস করলে একটু হেসে তাঁর বুকে মাথা রাখে। সে

হাসির তুলনা পাওয়া যায় একমাত্র আলোর মুখে জমে ওঠা একরাশ ছাইরঙা আষাঢ়ে মেঘের মাঝে।

দশ

তুহিন আর সারার ব্যাপারটা নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ একটু গুঞ্জন স্থুরু হয়েছিল, তবে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ষ্টেমের মত মেয়েদের ভেতরেও সেটা যে এতখানি ডালপালা বিস্তার করেছে তা তুহিন আগে বোঝেনি। তাদের নিয়ে এ গুঞ্জন বা আলোড়নের অবশ্য যথেষ্ট কারণও ছিল। সারার দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা ছিল এইরকম যে, কথাবার্ত্তায় সে একটু বেশীরকম বেআব্রু ছিল। অর্থাৎ নারীস্থলভ আত্মসচেতনতা ছিল না ব'লেই নিজেকে সে প্রচারধর্ম্মী ক'রে তুলতে পারেনি। তুহিন ট্রাম-বাসে বা সিনেমায় এ জিনিষটা লক্ষ্য ক'রে দেখেছে যে প্রত্যেক মেয়েই যেন তাদের নিজেদের জীবন্ত বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ টিকিট কাটার সময় ভ্যানিটি খোলা থেকে আরম্ভ করে ভুরুটা একটু বেঁকিয়ে পুনরায় সেটা বন্ধ করা পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টা তাদের মনের অবচেতন লোকে এই প্রশ্নটাই ঘোরাফেরা করে, 'আমাকে কেমন লাগছে?' সারার মধ্যে এই জিনিষটার অভাব ছিল বড্ড বেশী, আর একমাত্র সেই কারণেই অন্য মেয়ের চেয়ে সারাকে তুহিনের একটু আশ্চর্য্যরকম ভাল লেগে গেল। কিন্তু এ ব্যাপারটা একেবারেই ভাল লাগল না সারার সহপাঠিনীদের। নিঃসঙ্কোচ, জড়তাহীন কথাবার্ত্তা—যার জন্যে সারার মেয়েবন্ধুর

চেয়ে পুরুষবন্ধুর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল,—সেটাই ওদের মতে সারার একমাত্র অস্ত্র। অর্থাৎ, ওদের পরিভাষায় ঐ বিশেষ 'ঢঙটি' দিয়েই নাকি সারা বন্ধুতার পথ ক'রে নেয়। অথচ সারা নিজে এ বিষয়ে সত্যিই কিছু জানত না। এমন কি ওকে ঘুরিয়ে ঠাট্টা ক'রে কোন মেয়ে কিছু বললেও ও-জিনিষটা শাদা-ভাবেই নিত।

সেদিন বাসে কিন্তু ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সারা জানত আজকে তুহিনের সঙ্গে ফেরা সম্ভব হবে না। কারণ, সারার ছুটির পরেও তুহিনের আরও একটা ক্লাস ছিল। তাই সে কারুর জন্যে অপেক্ষা না করে সুচিত্রা, শেফালী, ঝর্ণা—ওদের সঙ্গেই বাসে উঠে পড়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃই হোক বা দুর্ভাগ্যের জন্যেই হোক, সেদিন তুহিনের শেষ ক্লাসটা না হওয়ায় সেও এতটুকু অপেক্ষা না ক'রেই দু-একটা আগের ষ্টপেজ থেকে সারাদের বাসটাতেই উঠে পড়েছিল। একেবারে পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিল ব'লে সারা প্রথমটায় তুহিনকে ঠিক দেখতে পায়নি। কণ্ডাক্টার টিকিট চাইলে সে একটু হেসে তার চিরন্তন পদ্ধতিতে সুচিত্রাকে একেবারে সহজভাবে জিগ্যেস করল, "বাসে উঠলে আবার টিকিট দিতে হয় নাকি রে?" এ সুযোগটা সুচিত্রা ছেড়ে দিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, "তুমি বাসের চারিদিকে একটু চেয়ে দেখলেই হয়তো অন্য কেউ তোমার টিকিট ক'রে নেবে। আমাদের তো সে উপায় নেই, তাই টিকিট নিতে হয়।" ওর কথায় শেফালী, ঝর্ণা দুজনেই যেন হাসি চাপবার জন্যে বাইরের

দিকে মুখ ফেরাল, ততক্ষণে সারারও তুহিনের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেছে এবং সুচিত্রার কথার নিহিতার্থটুকু ও নির্ভুলভাবে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সারা যে কি অদ্ভুত মেয়ে তা ওর সহপাঠিনী হ'য়েও সুচিত্রা ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই সারা যখন চীৎকার ক'রে তুহিনকে বলল, "তুমি টিকিট কেট না তুহিন, আমি তোমার টিকিট কেটেছি—" তখন সারার পার্শ্ববর্ত্তিনীরা আশ্চর্য্য না হ'য়ে পারে নি। এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তুহিনের অল্পবিস্তর আলাপ আছে, তাই পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হ'লো। সে এগিয়ে এসে সুচিত্রার দিকে চেয়েই সুরু ক'রে দেয়, "আপনারা কেউ আমার টিকিট কাটলেন না, কিন্তু সারাকে তো দেখলেন—"

সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্রা জুড়ে দেয়, "সারা এবিষয়ে একটু উদার স্বীকার করি, তাছাড়া আমরা টিকিট কাটলে আপনি হয়তো refuse করতেও পারতেন।"

পাশের যে লোকটির কাদামাখা জুতোটা তুহিনের হালকা চটিটার উপর ধীরে ধীরে চেপে বসছিল তাকে হাত দিয়ে একটু ঠেলে ইসারায় পায়ের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে তুহিন সুচিত্রার কথার উত্তর দিল, "আপনার বক্তব্যের প্রথম অংশটার সঙ্গে আমিও একমত, অর্থাৎ সারা যে উদার, এবং অনেকের চেয়ে বেশী তা একেবারে অনস্বীকার্য্য। আর আপনার কথার শেষাংশটা যদি সত্যিই হ'তো—মানে, আপনারা টিকিট কাটার পর যদি আমি refuseই করতুম, তাহ'লে বুঝতে হ'তো সারার সঙ্গে আপনাদের কিছু প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে।"

এবার সুচিত্রা বলবার আগেই তুহিনের কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে শেফালী উত্তর দিলে, "অন্ততঃ রূপের দিক থেকে তো বটেই ; আমরা তো ওর পাশে দাঁড়াতেই পারি না।"

শেফালী যে এরকম একটা উত্তর দিতে পারে তা তুহিন প্রথমটায় বিশ্বাস করতে পারেনি। মেয়েটিকে দেখতে সত্যিই সুন্দরী, তবে বড্ড বেশী রোগা ;—এত রোগা যে মনে হয় ওর সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন ওয়াটার-কালারে আঁকা—একটু ঝড়-জলেই ধুয়ে মুছে যাবে। তাছাড়া ও বেশীরকম রোগা ছিল ব'লে ওর চেহারার কমনীয়তা চোখে পড়তো না। নারীর সৌন্দর্য্য দেহের কয়েকটি বিশেষ বাঁককে (কার্ভ) কেন্দ্র ক'রে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে ; একটু সুপুষ্ট না হ'লে সেই দৈহিক বাঁকগুলি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠতে পারে না ; আর তা না হ'লে মুখ যতই সুন্দর হোক, সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণতা পায় না। শেফালীর বেলায়ও তাই ঘটেছিল, কিন্তু তবু প্রথম প্রথম তুহিনের চোখ দুটো ওর মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে যেত একান্তই অকারণে। মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়ে গেলে শেফালীর ছোট্ট মুখের ছোট দুটি চোখে কি যেন একটা চেনা ভাষা তুহিন লক্ষ্য করেছে। কিন্তু সারা এল তার শাদা ঘাড়ের ওপর মোটা বেণী দুলিয়ে, পরিস্ফুট লাবণ্য আর পরিপুষ্ট দেহসৌষ্ঠব নিয়ে—কখন আগুন-রঙা শাড়ি-ব্লাউজে, আবার কখন শীতাংশুর শুভ্রতা নিয়ে। ভেসে গেল—মুছে গেল—নিভে গেল ওয়াটার-কালারের ক্ষীণ শেফালী। সারা এসে অজস্র কথা, অফুরান প্রাণ, অনিঃশেষ হাসির রাশি রাশি ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিলে তুহিনের প্রাণে—ইসারায়

জানাজানি হ'য়ে গেল তারায় তারায়। চাঁদের ভস্ম মাখা পৃথিবীর বুকে যেমন ক'রে নিভৃতে ঝ'রে পড়ে শিশিরের ফোঁটা, ঠিক তেমনি এক বিন্দু নীলিম শিশির হ'য়ে নীরবে ঝরে পড়েছিল তুহিন সারার শুভ্রতায়।

কিন্তু এইসব বিগত দিনের ইতিহাস নিয়ে চল্‌তি 'টু-এ' বাস দাঁড়িয়ে পড়ে না, আর শেফালীর কথার উত্তর দেওয়ার জন্যে তুহিনকেও নতুনভাবে প্রস্তুত হতে হয়। সারা জানত কথায় তুহিন হার মানবে না। পরিস্থিতিটা ভারী হ'য়ে গেছে—তুহিনের পাল্টা উত্তরে সেটা আরও ভারী, আরও বিশ্রী হ'য়ে উঠবে। তাই সারা সুকৌশলে তুলে নিলে তর্কের তীর, ছুঁড়ে দিলে তুহিনের দিকে সহজ নিপুণতায়,—"দেখ তুহিন, আমার সামনেই আমার সমালোচনা ক'রে তুমি সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছ সন্দেহ নেই। কিন্তু এবার যদি আমার রূপ নিয়ে টানাটানি ক'রতে চাও তাহ'লে বুঝব অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার মাথাটা একটু···। আমরা সব বন্ধুরা তোমায় সীট খালি ক'রে না হয় দাঁড়িয়ে পড়ছি, তুমিই লেডিস্‌ সীট আলো করো।" ওর হাত নেড়ে কথা বলার ভঙ্গীতে তর্কের কালো মেঘটা উড়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। সবাই হাসল, এমন কি এতক্ষণ যে ঝর্ণা মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল সে-ও। তুহিন বুঝল সারার ইঙ্গিত, সে একেবারে ভিন্ন স্বরে ব'লে উঠল, "নাঃ, মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেও সুখ আছে; তবু খানিকক্ষণ শেফালীর মুখখানার দিকে চাইবার সুযোগ পাওয়া গেল। শুধু শুধু চেয়ে থাকলে লোকে গালাগালি দিত।" শেফালীর যেটুকু রাগ ছিল, তুহিনের কথায় তাও বাষ্প

হ'য়ে উড়ে গেল। একটু হেসে, একটু লাল হ'য়ে সে তুহিনের দিকে একবার চেয়ে দৃষ্টিটা আবার নামিয়ে নিলে। ইতিমধ্যে তাদের নামবার সময়ও হয়ে গিয়েছিল, তাই তুহিনকে নিজের সীটটা ছেড়ে দিয়ে শেফালী উঠে পড়ে; তারপর সুচিত্রার হাত ধ'রে টেনে নামবার সময় তুহিনের দিকে ফিরে বলে, "আচ্ছা চলি, কাল আবার দেখা হবে—"

একটু বেশীরকম উৎসাহিত হ'য়ে তুহিন উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই।"

ঝর্ণা আগেই নেমে গেছে, বসে রইল শুধু সারা আর তুহিন। কিন্তু তাদেরও বেশীক্ষণ বসা হ'লো না অথচ 'যেখানে নামবার কথা সেখানে নামা হ'লো না।' রেড রোডের পাশ দিয়ে যখন বাসটা বেঁকেছিল তখনই তারা দুজন নেমে গেল।

মাঠভরা এক-বুক ঘাসের ওপর সন্ধ্যার তামাটে মাথাটি নেমে এল—সারার বুকেও নামল তুহিনের হাল্কা চুলে ভরা মাথাটা। তারপর শুধু চুপচাপ, আর চুপচাপ।

এগারো

ছুটির দিনে সারার এত ভোরে কখনই ঘুম ভাঙে না, তবে আজ ভেঙে গেল। উঠে গিয়ে প্রভাসবাবুর ঘর থেকে সেলিংকোর্ট-এর কীট্‌সের কাব্য-সঙ্কলনটা নিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। হঠাৎ হুড়মুড় একটা পদশব্দে সারা চকিত হ'য়ে বই নামিয়ে নিলে। সে দরজার দিকে পিছু ক'রে শুয়ে ছিল—ঘুম-ঘুম চোখ, বালিসের চাপে ঈষৎ লালচে চুলগুলো কিছু অবিন্যস্ত, পিঠের কাপড়টা খ'সে পড়েছে, গায়ে পাতলা শাদা ব্লাউজটার তলায় কিছু নেই, দেহের শাঁখের মত শুভ্রাভাটা সহজেই চোখে পড়ে। শব্দ শুনে দরজার দিকে পাশ ফিরতেই বিছানার একেবারে কাছে তুহিনকে দেখে প্রথমটায় সে একটু লজ্জিতই হ'লো। আঁচলটা ভাল ক'রে জড়িয়ে, চাদরটা বুক অবধি টেনে, বিছানার অন্য পাশে একটু স'রে গিয়ে তুহিনের বসবার জায়গা ক'রে দিতে তার বোধহয় পনেরো সেকেণ্ডও লাগেনি। তারপর হাসতে হাসতেই বললে, "মহিলাদের শোবার ঘরে না ব'লে যখন ঢুকেই পড়েছ তখন না ব'লেই ব'সে পড়তে পার।"

"না ব'লে আসার জন্যে সত্যিই আমি লজ্জিত। কিন্তু একটা ঘুম-ভরা পরিবেশের মধ্যে তোমাকে দেখবার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারিনি—"

"বুঝেছি, হাজার লজ্জিত হ'লেও লজ্জাটি তোমার আগের চেয়ে বেশ কিছু কমেছে। সে যাক্, এই ভোরবেলা বেশ

পরিপাটি ক'রে প্যাণ্ট-কোট প'রে বেরুন হ'য়েছে যখন তখন নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যটা সাধু নয়। অন্ততঃ আমার এখানে আসার কারণটা তো বুঝতেই পারলুম না।"

"কারণটা হ'লো, তোমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আজকে কলেজ থেকে যে ষ্টিমার পার্টিটার ব্যবস্থা হ'য়েছে, শুনলুম তাতে তুমি যোগ দিচ্ছ না। সুতরাং—"

"বাড়ি চড়াও হ'য়ে ধ'রে নিয়ে যেতে চাও, কেমন? ওসব চলছে না মশাই, আমি কিছুতেই ঐ একপাল ছেলের ভিড়ে যাচ্ছিনে।" সারার মুখের দিকে চেয়ে তুহিন বুঝতে চেষ্টা করল যে সারা যা বলছে তা সত্যিই ওর মত কিনা, কারণ মাঝে মাঝে শুধু ঝগড়া করবার জন্যেই সারা অনেক কথা বলে যায়। আজও ঠিক তাই; কালো মোটা বেণীটা ফরসা হাতটির গায়ে একবার জড়াচ্ছে একবার খুলছে, মাঝে মাঝে তুহিনের মুখের দিকে চাইছে। তুহিনও একটু রাগ দেখিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বলে, "বেশ, তাহ'লে আমারও যাওয়া হ'লো না, বাড়ি ফিরে যাই।" সারা ধীরে ধীরে খাট থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর তুহিনের দিকে না চেয়ে জানলার দিকে ফিরে বলে, "তুমি বাবার সঙ্গে গল্প কর গে, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে তৈরী হ'য়ে নিচ্ছি।" সারার মুহূর্ত্তে-গম্ভীর-হ'য়ে-ওঠা মুখখানার দিকে তাকিয়ে তুহিন ঠিক কিছু বুঝতে পারল না, তবু জোর ক'রে একটু হাসি টেনে বলল, "সারা, তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে তো বরং যেয়ে কাজ নেই। তোমার শরীর খারাপ হয়নি তো?" ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গেই আবার সারার মুখটা আগের মতই উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, "না গো, না, শরীর আমার বড্ড ভাল। তুমি যাও, আমি এখুনি আসছি—"

"মেয়েমানুষকে সবচেয়ে বড় শাস্তি দেওয়া হ'চ্ছে তাকে তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নিতে বলা। হাতে যখন সময় আছে তখন কেন আর মিছিমিছি তোমাকে সেই চরম শাস্তি দিয়ে দোষের ভাগী হই। সুতরাং তুমি আধঘণ্টা অবধি নির্ভাবনায় দেরী ক'রতে পার।"

তুহিন বেরিয়ে যাওয়ার সময় একবার সারার মুখের দিকে তাকাল। একটা অদ্ভুত ম্লান হাসি দেখল তার মুখে,—এ হাসি তুহিন আগে কখনও সারার মুখে দেখে নি। সত্যিই সারার হাসিটা বড় ম্লান, বড় করুণ—ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল যেমন হাসে। তুহিন চলে যাওয়ার পরও সারা খানিকক্ষণ বিছানার ওপর বসে ছিল—তুহিনের কথাই ভাবছিল। অদ্ভুত খেয়ালী তুহিনের মন ঃ নিজে যখন যা মনে করে তাই করে, অন্যের ইচ্ছে ওর কাছে কিছুই নয়। অথচ কারুর ইচ্ছেয় ও বাধাও দেয় না, শুধু নিজে ক্রমশঃ দূরে স'রে যায়। সাধারণ লোকের মত ঝগড়া ক'রে ওরা নিজের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চায় না, সব দাবী পরিহার ক'রেই ওরা নীরব দাবী জানায় মানুষের মনের একেবারে গভীরে। ঘরে এসে কেউ অজস্র কথা ব'লে বিরক্ত করলে ওরা তাকে বেরিয়ে যেতে বলে না, শুধু নিজেই কাজের অজুহাতে রাস্তায় প্রচণ্ড রোদে খানিকটা ঘুরে বাড়ি ফিরে আসে।

শিল্পী-মনের ঐটেই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেড়ি। ওরা নিজেকে অস্বীকার করে সবচেয়ে বেশী—নিজের দাবীকে বিদ্রূপ ক'রতে ছাড়ে না। নিজের ব্যথা-বেদনাকে র'য়ে স'য়ে উপভোগ ক'রতেই ওরা চায়। তুহিনও সম্পূর্ণরূপে ওদেরই দলে ; নিজে যেখানে বাধা পায় সেখানে প্রতিপক্ষকে বাধা দিতে ও চায় না, শুধু দূরে স'রে যায়। আজও সারার একটিমাত্র কথাতেই তুহিন ব'লে ব'সল, যেয়ে কাজ নেই। ঐখানেই সারার দুঃখ। সারার অবচেতন মন যেন বলে, আপনিই যেমন তুহিন ঝ'রে পড়েছিল তার মাঝে, ঋতু ফুরিয়ে গেলে তেমনি আপনিই আবার সে মিলিয়ে যাবে বাতাসে—রেখে যাবে শুধু নিদাঘের নিদারুণ জ্বালা···। কিন্তু না, আর দেরী করা চলে না—সারা নেমে এল প্রভাসবাবুর বসবার ঘরে।

"একি সারা তুমি যে সত্যিই পনেরো মিনিটে নেমে এলে! ভাবছিলুম বেশ একটু দেরী ক'রে নামবে, আমি ততক্ষণ প্রফেসর রায়ের কাছে তোমরা সেই ছোট-বেলায় ঢাকায় যখন থাকতে তখনকার গল্প শুনব। সত্যি এত তাড়াতাড়ি আসবে ধারণা করিনি।"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা ব'লে যেই তুহিন থেমেছে অমনি সারা আরম্ভ ক'রল, "মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক ধারণাই তুমি ঠিকমত ক'রতে পার না, শুধু এইটুকু প্রমাণ করার জন্মেই বেশী তাড়াতাড়ি করলুম।"

"উঃ, খালি ঝগড়া, ঝগড়া আর ঝগড়া! সকালে ঘুম থেকে উঠে তুমিও কি অমিত রায়ের মত 'যত শানিয়ে-বলা কথা'

বানিয়ে রেখে দাও ?" সারা সঙ্গে সঙ্গেই যোগ ক'রে দেয়, "এর উত্তরও তো অমিত রায়ই দিয়েছে—'সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা', আর—"

"আর থাক্ সারা"—প্রভাসবাবুই মাঝপথে সারাকে থামিয়ে দিলেন—"তুমি যে বাংলাভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছো, 'শেষের কবিতা' গুলে খেয়েছো, তা আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি। এবার ভাল ক'রে দুধ-চিনি গুলে তুহিনকে আর আমাকে একটু চা খাওয়াও, যাতে কাজের কাজ হয়। যাও, তাড়াতাড়ি যাও।"

"বাবা আমার দোষটাই খালি দেখ, তুহিনকে তো চেন না—ঝগড়া পেলে ও আর কিছু চায় না—চা-ও না।" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাসবাবুর আর তুহিনের হাসির নিরবচ্ছিন্ন অবসরে সারা শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে পালিয়ে গেল। শুধু ওর সেই অপূর্ব্ব পালিয়ে-যাওয়ার ভঙ্গিটার দিকে তাকিয়ে তুহিন প্রভাসবাবুর দুটো-একটা কথার ভুল উত্তর দিল।

ওরা দুজনে যখন ষ্টীমারঘাটে পৌঁছল তখন ষ্টীমার ছাড়তে বড় বেশী দেরী নেই। শুধু এম. এ. ক্লাসের ছাত্রছাত্রীই নয়, ক'লকাতার অন্যান্য বহু কলেজের শ্রীমান-শ্রীমতীরা বিরাট ষ্টীমারখানায় ভিড় ক'রেছিল। আকাশে মেঘ ছিল, তবে সূর্য্যকে কালি মাখাতে পারেনি। বাঁধ-ভাঙা যৌবনের চঞ্চলতায় তরুণীর তনু থেকে যেমন শাড়ির আঁচলটা পিছলে পড়ে যায়, গঙ্গার উপচে-পড়া যৌবনের হলুদ গা থেকে রোদ-রঙা শাড়িটাও তেমনি বারে বার খসে পড়ছে।

চারিদিকে গ্রামোফোন, লাউড-স্পীকার, ছেলেদের উদ্দেশ্য-হীন উদ্দামতা, সব কিছুকে ছাড়িয়ে তুহিনের মন পালিয়েছে অন্য কোথাও। ডেকের চারিদিকে ছোট ছোট ফুলের তোড়ার মত গুচ্ছ গুচ্ছ রঙিন শাড়ির ভিড়, তারই কোনটাতে সারা আছে। তুহিন হয়তো চঞ্চল চোখে ওরই রক্তিম শাড়ির আমেজটুকু খুঁজে ফিরছিল। হু হু ক'রে জলের কণা-ভরা হাওয়া অনাহূত অতিথির মত ষ্টীমারে উঠে আসছে। ষ্টীমারের একেবারে কোণের দিকে তুহিন দাঁড়িয়ে ছিল। প্লেন উড়লে তার বাইরেকার বিরাট আওয়াজটা যেমন ভিতরের যাত্রীরা বিশেষ টের পায় না, তুহিনেরও হয়েছিল কতকটা তাই। রেলিঙের ওপর মাথাটা হেলিয়ে ও তাকিয়ে ছিল দূরে ঘাস-রঙা তীরের দিকে। হঠাৎ কাঁধে মৃদুস্পর্শে তুহিন চমকে ফিরে তাকাল।

"আমার কথা অমন ক'রে আর নাই বা ভাবলে—"

"ভাবব না ব'ললেই যদি ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যেত তাহ'লে মানুষের মনোজগতে কান্না ব'লে কিছু থাকত না, সারা। তাছাড়া তোমাকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে আমার সমস্ত ভাবনাচিন্তাগুলো একেবারে এই ষ্টীমারের চাকায় গুলিয়ে ওঠা জলের মত ভেতর থেকে উল্টে যাচ্ছে। সত্যি সারা, দোহাই তোমার, ঐ আগুন রঙের শাড়ি-ব্লাউজ আর প'রো না। শেষকালে এত ছেলেমেয়ের সামনে—"

"থাক্ থাক্, আর না—এত ছেলেমেয়ের খাওয়া হ'য়ে গেল, সে খেয়াল আছে? আজকে আমরা তোমাদের পরিবেষণ ক'রে খাওয়াচ্ছি তা জানো ত? তবে আমরা খাওয়াচ্ছি ব'লেই

বোধহয় ছেলেরা এত দ্বিগুণ উৎসাহে খেতে আরম্ভ ক'রেছে যে, তুমি যদি আর একটু দেরী ক'রে যাও তাহ'লে বোধহয় শুধু পান পরিবেষণ করতে হবে।"

"মাথা খারাপ, এরপর আবার দেরী করে! চলো—চলো—"

কথার শেষে তুহিন সারার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সারা তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে অস্ফুটস্বরে ব'লে ওঠে,—"এটা ষ্টীমার—অনেকের ভিড়—তাই এসময় মনের ষ্টীমটা তাড়াতাড়ি কমিয়ে ফেল।"

তুহিন অল্প হেসে ছেলেদের দলে মিশে যায়। অদ্ভুত ওর এ্যাডাপ্‌টেবিলিটি—রবারের চিরুনির মত সবরকম চুলের পক্ষেই সমান—ভাঙেও না, সিধেও থাকে না। শুধু সেই কারণেই সব জায়গা ভর্ত্তি হওয়া সত্ত্বেও ও যখন সিঁড়ির পাশেই একটা অতিরিক্ত পাতা পেতে ব'সল তখন সবাই বাধা না দিয়ে বরং যেন বাধিতই হ'লো। সবাই পরিবেষণ ক'রছে—সারা, সুচিত্রা, শুভ্রা, পূর্ণিমা, এমন কি ঐ রোগা শেফালী পর্য্যন্ত। সবাই কাপড়টা একটু গুটিয়ে প'রেছে, শুধু সারা নয়—ওর লাল শাড়ির তলার দিকটা ষ্টীমারের কাদামাখা জলে ভিজে গেছে, কপালে ঘামের ফোঁটা মাঝে মাঝে ব্লাউজটার গায়েই মুছে নিচ্ছে ;—ওতেই ও সুন্দর! কিন্তু মুশকিল বেধেছে এই যে, সারা যা পাচ্ছে তুহিনের পাতে চাপিয়ে যাচ্ছে, অথচ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তুহিন নেহাৎই যেন ভ্যাকুয়াম প্যাক-করা টিন—ইচ্ছেমত কিছুতেই সে ভেতরের বস্তুর ওজন বাড়াতে বা কমাতে পারে না। ফলে যখন বেশ কিছু নষ্ট ক'রে তুহিন ওঠবার তাল

ক’রছে তখন সারার একটু বাঁকা কথার তালিম কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারল না।

দুপুরের দিকে আকাশ কালো ক’রে ভীষণ ঝড় উঠলো, তারই সঙ্গে বৃষ্টি,—ষ্টীমারের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হ’লো। তুহিন এবার দাঁড়িয়ে ছিল অন্য আরও ছেলেদের সঙ্গে সারাদের দলটির কাছেই। এখান থেকে সারাকে বেশ স্পষ্টই দেখা যায়— কালো আষাঢ়ে মেঘের তলায় রক্তিম কৃষ্ণচূড়ার কুঁড়ির মত ও যেন আকাশের পটভূমিতেই আঁকা। হাওয়ার সঙ্গে হাডু-ডু খেলে ওর চুলের বেণী গিয়েছে খুলে; শেফালী আবার অবেণীবদ্ধ চুলগুলোকে ধীরে ধীরে বেঁধে দিচ্ছে। ক্রমে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশের গা-টা দুরন্ত হাওয়ায় ফেটে-যাওয়া কলাপাতার মত সরু সরু চিড়্ খেয়ে গেছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে বেলাশেষের রোদ যেন কালো আঙটির পাথরে সোনার জলের কাজ করা। ধীরে ধীরে সেটুকুও নিভে গেল। ষ্টীমার ফিরে এল জাহাজ-ঘাটে। চারিদিকে পাতলা অন্ধকার ভারি কুয়াশার মত ভেসে চলেছে, চারিদিকের অজস্র ডিঙি নৌকো আর ছোট ছোট ষ্টীমারের পেটে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে; তারই অল্প আলোয় মাঝিমাল্লাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংসারগুলো চোখে পড়ে। রান্না চাপিয়েছে— এখানে ওখানে আলু-পেঁয়াজের খোসা ছড়ান; বাতাসে একটা সস্তা হোটেলি গন্ধ। ট্রাম-বাস, জাহাজঘাটে সন্ধ্যার ছায়াভরা ভিড়, তারই মাঝে তুহিন ও সারা মিলিয়ে গেল।

সারা কিন্তু সেদিন সহজে পালিয়ে যেতে পারল না। কারণ, তুহিন ওকে ধ'রে নিয়ে গেল ওর বৌদির কাছে। আগেই বলেছি, তুহিন ওর দাদা-বৌদির কাছেই মানুষ। তবে তাঁরা ওকে, পিতামাতার অভাব পূরণ ক'রতে গিয়ে, একটু বেশী স্নেহ করে ফেলেছিলেন। ফলে তুহিন অফুরন্ত টাকা-পয়সা হাতে পেয়েও কেন যে অমানুষ হ'লো না সে-কথা জিগ্যেস করলে ও বলে যে, সে অমানুষই হয়েছে। কারণ, একসঙ্গে এত গুণের সমাবেশ নাকি কোন মানুষের চরিত্রে থাকে না; তার চরিত্র অপার্থিব। তুহিনের দাদা শিবেনবাবু নিজেকে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে পূর্ণ নিয়োজিত করলেও জীবনে ললিতকলার যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করতেন না। অর্থাৎ মনের বিকাশই যে মনুষ্যত্ব প্রকাশের পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক তা তিনি জানতেন। এবং ঐ সঙ্গে আরও জানতেন যে ব্যবসাদারি বুদ্ধি দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুটো-একটা কূটনৈতিক চাল চালা গেলেও এক-আধটা আধুনিক কবিতার রসোপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়। কারণ, প্রথমটা হ'লো জাগতিক, দ্বিতীয়টা মানসিক। মনের ক্ষেত্রটা জগতের স্থূল গণ্ডিটাকে ছাড়িয়ে আরও বহু উর্দ্ধে এক সূক্ষ্মতম ব্যাপ্তির মাঝে বিলীন হ'য়ে গেছে,—সেখানে ওঠা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ এই ব্যাপারটাকে তুহিন যে বেশ সড়গড় ক'রে নিয়েছে শুধু সেই কারণেই তিনি তুহিনকে আরও একটু বেশী স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে তুহিনকে একটু ঘাঁটিয়ে দেখবার জন্যে ফট্ ক'রে ব'লে বসতেন, "আচ্ছা, জীবনে কবিতার কি দাম আছে, তুহিন!

আমাদের দেশে কবি বা সাহিত্যিক একটু কম জন্মিয়ে যদি ছুটো-একটা রাজনীতিবিদ বেশী জন্মাত তাহলে বোধহয় ভারতবর্ষ তার কিছুটা মূল্য পেত ; কি বল তুহিন ?" তুহিন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে উত্তর দিত, "দেখ দাদা, মানুষ তু' রকম ভাবে বাঁচতে পারে। এক হ'লো দেহের বাঁচা, আর এক হ'লো মনের বাঁচা। মন নিয়ে যাদের কারবার তাদের জগৎটা অনেক সূক্ষ্ম অনেক বিস্তৃত। তাদের কাছেই কবিতার দাম। তাছাড়া কোন জিনিষের মূল্য বা দাম তার প্রয়োজন-বোধের ওপর গড়ে ওঠে ; কিন্তু প্রয়োজন-বোধ কথাটা একটা মস্ত বড় ফাঁকি। মানে, সোনা রূপো হীরে, এইসব খনিজ বস্তুগুলোর কোন প্রয়োজনই হয়তো ছিল না, শুধু শুধু মানুষ সেগুলোর দাম বাড়িয়ে গেছে ; একমাত্র মুগ্ধ করা ছাড়া সেগুলোর প্রকৃতপক্ষে কোন দামই নেই। ঐসব বস্তুগুলোকে যেদিন মানুষ মিথ্যে ব'লে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে, সেদিন আমিও আর কবিতার দাম আছে ব'লে লাফালাফি করব না। তাছাড়া কবি না জন্মিয়ে রাজনীতিবিদ জন্মালে ভারতের মূল্য বৃদ্ধি হ'তো, এরকম অবান্তর কথা তোমার মত একজন পাকা হিষ্ট্রির ছাত্রের কাছে আশা করিনি। কারণ, তুমি জানো ভারতের সভ্যতা-সাহিত্য এসব একদিনের ব্যাপার নয়। সেই বৈদিকযুগ থেকে চলে আসছে ; এর সঙ্গে ভারতের সব নরনারীর প্রাণের যোগ ; একে কেন্দ্র ক'রেই রাজনীতি গ'ড়ে উঠেছে। সুতরাং তোমার এ প্রশ্নটা ঠিক তেমনি অবান্তর যেমন তুমি যদি জিগ্যেস ক'রতে একটা গাড়ির চাকাকে চালু করার জন্যে টায়ার না ক'রে বেশী টিউব

করলে বা টিউব না ক'রে বেশী টায়ার করলে বোধহয় ভাল হ'তো।"

তুহিনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবেনবাবু স্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলতেন, "ওগো, তুহিনের গলা শুকিয়ে গেছে, শীগগির চা আন—"

তুহিন হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ব'লে যায়, "শুধু শুধু আমাকে বকিয়ে মারাই দেখছি তোমার কাজ। এবার থেকে সাবধান হলুম।"

কিন্তু এসব তো তুহিন আর শিবেনবাবুর পুরোনো আলোচনা। এর মাঝেই সারা এসে আজ হঠাৎ আর একটা নতুন অধ্যায় সুরু ক'রে দিল। তুহিন যখন সারাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন শিবেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী মিনতি দুজনেই ঘরে ছিলেন। তুহিন ঢুকেই বৌদির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, "মিলিয়ে দেখ তো বৌদি, যা বলেছিলুম সত্যি কি না।"

সারা লজ্জায় প্রথমটা একটু লাল হয়ে গিয়েছিল। তাই কিছু বলতে পারে নি, কিন্তু মিনতি সঙ্গে সঙ্গেই জিগ্যেস করেছিলেন, "এরই নাম বুঝি সারা—"

সারা ততক্ষণে লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়, "হ্যাঁ বৌদি, তাছাড়া তুহিনের পাল্লায় আর কে পড়ে বলুন? সেই সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এখনও ফিরতে দিলে না—এধারে ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। বৌদি, আগে কিছু খেতে দিন, তারপর যত বলবেন বকবক করব।

আপনার দেওরটির খাওয়ার যা পরিচয় পেলুম তা যদি শোনেন—"

মিনতি মাঝ পথেই সারাকে থামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, "উঃ, কথায় দেখছি তুমি তুহিনের চেয়ে কিছু কম নও। যাক্, সব কথা পরে শোনা যাবে, এখন তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা দেখিগে।"

এইবার শিবেনবাবু এগিয়ে এসে বললেন, "আরে, ওর কাপড়টা ভিজে কি হয়েছে দেখেছ! একটা কাপড়-চোপড় কিছু দাও, তারপর রান্নাঘরে ঢুকো।"

সারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মিনতি তাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সারা গা-টা ধুয়ে, চুল খুলে ভাল ক'রে মাথা আঁচড়ে ভারি সুস্থ বোধ করল। রান্নাঘরে গিয়ে মিনতিকে সাহায্য করতে করতে নিজেও অজস্র বকল, মিনতির কাছেও অনেক গল্প শুনল আর জানতে পারল তুহিনের খাওয়াটা ষ্টীমারে যা দেখেছে ঠিক অমনিই সৌখীন। সবাইকার যা ভাল লাগে তুহিন তা মোটেই রুচির সঙ্গে খেতে পারে না— তার মানে এই নয় যে, ও একটু অসাধারণ কিছু খেতে ভালবাসে। বরঞ্চ রসনার পরিতৃপ্তিকর ব'লে যে সব বস্তু অসাধারণত্ব লাভ করেছে (রাবড়ি বা দুধের অন্য কোন প্রিপারেসান বা ইলিশ মাছ ইত্যাদি) তা তুহিন যেন মোটেই সুখের সঙ্গে খেতে পারে না। এর জন্যে ও নিজেও লজ্জিত। তবে ও বলে,—রুচির ওপর জুলুম করলে তার একটা যুক্তি আছে ; কিন্তু রসনাটা এমন জিনিষ যে একবার বেঁকে বসলে আর কোন যুক্তিই মানবে না।

একটু রাতে তুহিন, শিবেনের গাড়িটায় ক'রে সারাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। আবার একদিন আসবার কথা দিয়ে তবে সারা সেদিন মিনতির কাছ থেকে ছুটি পেয়েছিল। সারার বাড়িতে প্রভাসবাবু একটু উদ্বিগ্ন হ'য়েছিলেন ঠিকই, তবে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে বরং খুসীই হ'লেন। তুহিন ছেলেটিকে তাঁর ভালই লেগেছিল—শুধু ওর নিঃসঙ্কোচ কথা-বার্ত্তার জন্যেই নয়, ওর স্বভাব-সুলভ ছেলেমানুষিটাও প্রভাস-বাবুকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু সে কথা যাক—কারণ, তুহিন নিজে কথা বলতে খুবই ভালবাসে, তবে নিজের কথা অন্য কারুর মুখে শুনতে ভালবাসে না। তাই তুহিনকে সেদিন যা সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল সেই কথাই আরম্ভ করা ভাল। রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে তুহিন অবাক হয়ে গেল। সারা তার বিছানায় বসে-বসেই চুল খুলেছিল, ভুলে কালো সিল্কের রিবনটা ফেলে গিয়েছিল। শাদা বিছানাটার এক কোণে কালো রঙের রিবনটা পড়ে ছিল দেখেই তুহিনের শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি আসে। সে অনুভূতির তুলনা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে গায়ে পরা শার্টের ওপর দিয়ে একটা শুঁয়োপোকা হেঁটে গেলে যেমন গায়ের ভেতর পর্য্যন্ত শিরশির ক'রে ওঠে—এটা যেন কতকটা সেইরকম। ফিতেটা স্পর্শ না ক'রেও তুহিনের গায়ে যেন একটা অদ্ভুত স্রোত ব'য়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে সারার মাথার পেছন দিকটার ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়ালো। দুটো কালো বেণী—দু'পাশে সমান ভাবে চুল ভাগ করা—মাঝখানে সরু শাদা সিঁথেটা প্রায়

পীতাভ ঘাড়ের কাছ অবধি নেমে এসেছে, ঠিক তার তলায়ই লাল রঙের ব্লাউজটা। তুহিন চোখটা বুজেই বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে নাকের কাছে কালো রিবন্‌টা টেনে আনে—কি মিষ্টি একটা তেলের গন্ধ! কিছুতেই ঘুম আসে না—গন্ধটা যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। বার বার ফিতেটা তুহিন হাতে জড়ায়, আবার খুলে ফেলে নাকের কাছে নিয়ে আসে। সামান্য একটা কালো রঙের ফিতে—মাথার চুলের তেলের বাসি-হওয়া একটা ফিকে গন্ধ! উঃ, ছোট্ট একটা দেড়-গজি ফিতে—একটা জীবন্ত মানুষের দেহের সবটুকু তাপ-গন্ধ যেন ধ'রে রেখেছে। মনে হচ্ছে মানুষটা যেন কাছেই শুয়ে, তার দেহের সবটুকু সৌরভ চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছে,—চেতনায় যেন মূর্চ্ছা নামছে। ঘুমটা যত নিবিড় হ'য়ে আসছে ততই সারার উজ্জ্বল মুখখানা যেন স্পষ্ট হ'য়ে আসছে। সারার মুখটা যেন ঘুমের রঙেই আঁকা। আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মাঝে তুহিনের স্মৃতির অতলে সারার রক্তিম শাড়ির ঘের দেওয়া মুখখানা স্বপ্নের মত ভেসে চলেছে। বাইরে থেকে বৃষ্টির গন্ধ মেশা হাওয়া ভেসে আসছে, তার সঙ্গেই ফিতের তেলের গন্ধটা মিশে অদ্ভুত মাদকতার ঘোর। তুহিন একসময় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে—কিন্তু তবু স্বপ্নের মাঝেও সারার আবছা একটা মুখের ছবি। সে ছবি আষাঢ়ে মেঘের মতই বার বার মুছে কালোয় কালোয় একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই তুহিনের মনে হ'লো সারাকে আপন ক'রে না পেলে যেন তার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে—ব্যর্থ হ'য়ে যাবে তার রাশি রাশি কবিতা। তুহিন সারাকে বিয়ে করবে—সারা তার বউ

হবে। সুন্দর সারা, শুভ্র সারা,—অশ্রুর মত উজ্জ্বল সারা—কল্পনার মত সোনালি সারা, পাখীর পালকের মত নরম সারা,—সারা, সারা, সারা,—সেই প্রথম দিনের দেখা সারা……

ভোর রাতে বৃষ্টির গানে তুহিনের ঘুম ভেঙে যায়। দুটো-একটা ভোরের পাখীর বৃষ্টি-ভেজা ডাক…দূরে গির্জ্জের ঘড়ির অস্পষ্ট ধ্বনি। তুহিন বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। কবিতার খাতায় ধীরে ধীরে লিখে চলে—

বৃষ্টির গান—
কত হাজার বছর ধরে
কত মরণের শেষে
জীবনের সোনালি সকালে
একটানা শুনে গেছি।
ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেছে,
শুনেছি বৃষ্টির রাগ—
করুণ ভৈরবী স্থরে বাঁধা ;
কত চেনা মুখ সে স্থরের চারি পাশে ভিড় করে আছে।
মনে হ'য়েছে শয্যার প্রান্তে
কে যেন ছিল, আর নেই—
শুধু তার লম্বা চুলের গোছা
হাওয়ায় উড়েছে।
তনিমার সৌরভের মত ঘরেতে বৃষ্টির ঘ্রাণ,
বাতাসে বৃষ্টির গান
করুণ কান্নার মত একটানা বাজে

বারো

সারার চোখে যে একটা চশমা ছিল সেটা বোঝা গেল যখন চশমাটা ভেঙে গেল। ফিকে ওয়াইন্ কালারের ট্রান্সপেরেন্ট চশমাটা ওর মুখের সঙ্গে এমন অদ্ভুতভাবে মিশে গিয়েছিল যে মনে হ'তো ওটা বুঝি ওর মুখেরই কোন একটা অঙ্গ। কেউ যদি হঠাৎ তার গোঁফটা কামিয়ে ফেলে তাহ'লে যেমন প্রত্যেকের চোখ পড়ে তার মুখের ওপর, চশমা ভেঙে সারার হ'য়েছিল ঠিক সেই অবস্থা। ছেলেদের মধ্যে একদল বললে, এতদিনে সারাকে আরও ভাল দেখতে হয়েছে; আর একদল ঠিক উল্টো কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, এবার সারাকে কেমন যেন বিশ্রী লাগছে। অথচ সারার নিজের মনে এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি—ও যেমন ছিল তেমনিই আছে, শুধু চোখে একটু অল্প দেখে ব'লে আস্তে চলাফেরা করে। এ ব্যাপারটা তুহিন প্রথম লক্ষ্য করল যখন সারা ওর কাছে কলমটা চাইতে গেল,—"আমার কলমটা ভুলে রেখে এসেছি, তোমার পেনটা একটু দাও তো।" তুহিন মেয়েদের রাগিয়ে দিতে একটু বেশী ভালবাসে। কারণ জিগ্যেস করলে বলে, মেয়েদের রূপটা এত নরম, এত স্যাঁৎস্যাঁতে যে, মাঝে মাঝে ওর ওপর রোদ না পড়লে বড় একঘেয়ে লাগে। বর্ষাকালে নতুন-রঙ-করা বাড়ি যেমন জল লেগে লেগে চুপ্‌সে যায়, তারপর একদিন রোদ উঠে সব জল শুষে নিলে আবার নতুন ক'রে রঙ ফুটে ওঠে, মেয়েদের

মুখের ওপর রাগের প্রতিক্রিয়াও ঠিক তেমনি। রাগ তার একটু তাপ, একটু রূপ, একটু রঙ নিয়ে মেয়েদের ঠাণ্ডা মুখখানায় ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে দেয় কিছু লালিমা—আবার ফুটে ওঠে নতুন রঙ। সারা পেনটা চাইতে ওকে একটু রাগিয়ে দেবে ব'লেই তুহিন অকারণে ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। সারা সত্যিই রেগে যায়, কোন কথা না ব'লে তুহিনের পকেট থেকে পেনটা তুলে নিয়ে চলে যায়। তখনকার মত তুহিনও কিছু বলবার সুযোগ পায় না।

ছুটির সময় সারা আজকে দেরী ক'রে না নেমে তাড়াতাড়িই বেরিয়ে আসে। সুচিত্রাদের দলটা এ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিল, সারাকে একা আসতে দেখে তারা একটু অর্থপূর্ণভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রল। সারা এসে একটু ওদের কাছে দাঁড়াল। তারপর নেহাৎই একটা কিছু বলতে হবে ব'লে বলল, "ভাই, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে, কি ক'রে রাস্তা পেরুব—"

"তোমার আবার রাস্তা পার ক'রে দেওয়ার লোকের অভাব" —সঙ্গে সঙ্গেই শেফালী জুড়ে দেয়, "একবার শুধু ব'ললে হয় এখুনি কত হাত এগিয়ে আসবে।" ওর কথায় সবাই একটু একটু হেসে নিলে, যার হাসি পায়নি সেও সারাকে অপদস্থ করার এমন সুযোগ ছেড়ে দিল না। সারার নিজেরও সেদিন মনটা ভাল ছিল না, তাই হঠাৎ একটু বেশী রেগে ওদের দলটাকে ছেড়ে রাস্তা পেরুবার সময় ব'লে গেল, "সত্যিই অভাব আমার কিছুই নেই, তাই অকালে তোদের মত স্বভাবটাও ছোট হ'য়ে যায়নি।"

ও-ফুটে শুভ্রার সঙ্গে দেখা হ'লো। শুভ্রার সঙ্গে সারার সত্যিই বনিবনা আছে, মেয়েটাও ভীষণ ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ছিটের একরঙা জামার চেয়ে ও নানারঙের ফুলতোলা জামা পরতেই ভালবাসে—ওকে মানায়ও ভাল। কারণ শুভ্রা ফরসাও ছিল, মুখখানাও নেহাৎ মন্দ না। তবে ও বড্ড শান্ত ছিল, বড্ড ধীর ছিল,—আর চেহারার মধ্যেও একটু ধীর, মোটাসোটা ভাব ছিল। এ জিনিষটা ঠিক শুভ্রারও পছন্দ ছিল না ; সে মোটা এ কথাটা ভাবতেও তার খারাপ লাগত। তাই সারার চট্‌পটে কথা আর চম্‌মনে চলাফেরার ভাবখানা তাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল—সারাকে সে হঠাৎই ভালবেসে ফেলেছিল, তবে তার মধ্যে কোন আকস্মিকতার মোহ ছিল না, সে ভালবাসা একেবারে খাঁটি। আজকে তার কয়েকটা বই কেনার প্রয়োজন, তাই সামনে বইয়ের দোকানগুলোয় সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সারার সঙ্গে দেখা হ'তে শুভ্রাকে সে বাড়ি যাবে কিনা জিগ্যেস ক'রল। শুভ্রা বললে, তার যেতে একটু দেরী হবে। সারা তার হাতে তুহিনের কলমটা দিয়ে বলল, "ভাই, তুই যখন আছিস তখন তুহিন এলে এটা দিয়ে দিস। বলিস সারা চলে গেছে।"

আর অপেক্ষা না করে সারা সামনের ২-এ বাসটায় উঠে পড়ে। শুভ্রাকেও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, একটু পরেই তুহিন এসে যায়। রাস্তায় বেরিয়ে চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে সে কাকে যেন খুঁজল ; সারার নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে দেখতে পেল শুধু শুভ্রাকে। তারপর তার চোখের দিশাহারা

চাউনিটা আরও উদাস, আরও অর্থহীন হ'য়ে গেল। শুভ্রার কাছ থেকে পেনটা নিয়ে সে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। শুভ্রা আরও কয়েকটা কি যে কথা বলছে তা ওর কানেই যায় নি। বাস এসে দাঁড়ায়, তুহিনও উঠে পড়ে—আনমনাভাবেই একটা খালি সীটে বসে পড়ে। বাস চলেছে, তুহিনের মনও থেমে নেই—এলোমেলো কত কি যে ভাবছে তার বুঝি শেষ নেই। কানের কাছেই কণ্ডাক্‌টারটা চীৎকার করছে। পরনে হাফপ্যাণ্ট, কাঁধ থেকে চামড়ার ব্যাগটা ঝুলছে, পান-খাওয়া লাল দাঁতগুলো বার করে মাঝে মাঝে ড্রাইভারের সঙ্গে কি যেন কথা বলছে আর হাসছে। রেকর্ডের মধ্যে কোথাও একটু গর্ত্ত থাকলে তার মধ্যে সাউণ্ড-বক্স্‌টা পড়ে যেমন একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হ'তে থাকে, কণ্ডাক্‌টারের গলার আওয়াজও যেন কতকটা সেইরকম। "চলিয়ে বাবু, চলিয়ে—ভবানীপুর, কালিঘাট, বালিগঞ্জ···এ পেরাইভেট্‌ (প্রাইভেট্‌ গাড়িকে) গাড়ি, সিধা করো না—এ বেটা রিক্সা, চাপা পড়ে গা, কেয়া ?" এ্যালার্মের কর্কশ ধ্বনির মত এই একটানা ধ্বনিতে কত যাত্রীর চিন্তার ধারা ছিঁড়ে যায়—তন্দ্রার ঘোর কেটে যায়, বই থেকে মন পালিয়ে যায়। কারুর কারুর আবার এ ধ্বনিও কানে ঢোকে না, বন্ধুর সঙ্গে যেমন গল্প করছে করতেই থাকে। এ ব্যাপারটা তুহিন রেডিওর ক্ষেত্রেও দেখেছে। অনেকের ঘরে রেডিও থাকে, শুধু রেডিও না থাকলে মান থাকে না বলেই। তাদের কানের কাছে রেডিওটা যত বিপুল জোরে বাজে, তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা ততোধিক তুমুল জোরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ;

অর্থাৎ রেডিওটা বন্ধ হওয়ার সঙ্কেত যখন জানান হয় তখনই তাদের খেয়াল হয় যে এতক্ষণ রেডিওটা চলছিল। বাসের কণ্ডাক্টারের গলাও তেমনি অনেকের কর্ণপটাহ ভেদ করতে পারে না, তাদের প্রতি তুহিনের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কারণ, যারা হাজার অসুবিধে সত্ত্বেও বহির্জগৎ থেকে মনটাকে পৃথক করতে পারে তারা হিমালয়ের পাদদেশে গেলে যে সিদ্ধ যোগী-পুরুষ হ'তে পারে এ বিশ্বাস আর কারুর না থাকলেও তুহিনের আছে।

বাস এগিয়ে চলেছে। পেট্রলের পোড়া গন্ধ ছাড়াও বাসের আরও একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, ফুটবোর্ডে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে গন্ধ এসে নাকে লাগে। প্রত্যেক রাস্তারও এক-একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে—বৌবাজারে এসে যখন বাসটা থামে তখন কাশীর জর্দা আর ধূপের একটা মিশ্রিত গন্ধ ভেসে আসে। চৌরঙ্গির ওপরের হাওয়াটাতেও একটা সস্তা এ্যামেরিকান আবহাওয়ার আভাস টোব্যাকোর গন্ধের সঙ্গে মিশে ঘ্রাণেন্দ্রিয়টাকে উন্মুখ করে দেয়। বাস চলতে থাকে—এলগিন রোডের লাল অটোমেটিক বাতির তলায় থামে। তুহিন ধীরে ধীরে নেমে যায়—হাতের দু' আনার টিকিটটা নর্দ্দমায় উড়ে পড়ে।

তেরো

পরদিন একটা অফ্ পিরিয়ডে গেটের বাইরে সারার সঙ্গে দেখা। তুহিনকে দেখেই সে না-দেখার ভান ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তুহিনও চুপ ক'রেই দাঁড়িয়ে ছিল এবং আরও কতক্ষণ থাকত তার ঠিক ছিল না। হঠাৎ একটা বাচ্ছা ছেলে তুহিনের কাছে এসে হাত পাতল, "বাবু, আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছি বাবু, খেতে পাইনা বাবু, একটা পয়সা দিন বাবু—" ছেলেটা এক মিনিটে একাধিক 'বাবু'র ছড়াছড়ি করতে লাগল আর সে যে রেফ্যুজি তা বহু দুঃখের কথা জানিয়ে বার বার বোঝাতে চেষ্টা ক'রল। কিন্তু আজকাল বাচ্ছা ছেলেকে পয়সা দিতে কিছুতেই মন সরে না। তুহিন বহুবার দেখেছে পয়সা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিড়ির দোকানে ছোটে। তুহিন তাই প্রথমেই পয়সা না বের করে ছেলেটার সঙ্গে একটু আলাপ জমালে, "তুমি কোথা থেকে আসছ বললে,—ঢাকা? ও, তাহ'লে তো নিশ্চয়ই সারাকে চেন, না? সেই যে খুব কথা বলে, খুব রেগে যায় মেয়েটা—"

তার কথা শেষ করতে না করতেই ছেলেটা খুব উৎসাহিত হ'য়ে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ বাবু, তাকে চিনি। সে বড় দুষ্টু মেয়ে বাবু, আমার হাত থেকে মুড়ি কেড়ে নিয়েছিল—" ততক্ষণে সারা, তুহিন দুজনেই হেসে উঠেছে। ছেলেটা তাদের হাসিতে আরও একটু উৎসাহিত হ'য়ে বলে, "সে এখনও ঢাকায় প'ড়ে আছে বাবু,

আপনার সঙ্গে দেখা হ'লে বলবেন আমি তাকে এমন মারব, মুড়ি খাওয়া বার ক'রে দেব। একটা পয়সা দিন না বাবু, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" তুহিন হাসতে হাসতে সারার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ছেলেটিকে বললে, "ওর কাছে আমার সব পয়সা রেখে দিয়েছি। ওর কাছ থেকে চাও, এখুনি পয়সা দেবে।"

"ও দিদি খুব ভাল, বাবু। আমাকে এখুনি পয়সা দিয়েছে। আর চাইলে রেগে যাবে।"

"আরে ধ্যুৎ, বলছি আমার সব পয়সা ওর কাছে আছে। গিয়ে বল, বাবু পয়সা চাইছে, না দিলে আপনাকে ধ'রে নিয়ে যেতে বলেছে।" ছেলেটা অগত্যা আবার সারার কাছে গিয়ে হাত পাতে। সারা বলে, "পয়সা তো দিয়েছি—এবার চাইলে মারব।" ছেলেটি কাতরভাবে বলে, "বাবু পয়সা চাইছে, না দিলে আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে—" সারা হাসি চাপবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরায়। তারপর আরও চারটি পয়সা ছেলেটির হাতে দিয়ে তুহিনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, "বাচ্ছা ছেলেটার সঙ্গে কি হ'চ্ছে তুহিন, ছেলেমানুষির কি শেষ নেই?"

"ছেলেমানুষির যদি শেষই থাকত তাহ'লে তুমি কি কাল রেগে একা-একা পালিয়ে যেতে পারতে?"

"আমি রেগে পালিয়েছি কে বলেছে তোমায়— ?"

"ও, আমার তাহ'লে ভুল হয়েছে, তুমি কাল মোটেই রাগনি।

আজ বরং তাহ'লে একটু রেগে গিয়েই না হয় আমার জন্যে অপেক্ষা করো।"

সারা হেসে ফেলে, তুহিনের পিঠে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে গেটের ভেতর ঢুকে যায়। তুহিন সেইদিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ক্লাসে চলে যায়।

ছুটির পর দেখা হ'তেই তুহিন সারাকে বললে, "বড় ক্ষিদে পাচ্ছে, সারা—"

"তার মানে তুমি আমাকে নিয়ে কফি-হাউসে যেতে চাও তো? তা আমি যাচ্ছিনে। প্রেমের ঐ নোংরা, দুর্ব্বল রূপটা কফি-হাউসে বসে আর নাই দেখলে—"

"অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ, কাপ দুয়েক কফির ফরমাশ ক'রে যে সব তরুণ-তরুণী প্রেমালাপ জমাতে কফি-হাউসে গিয়ে বসে, তাদের দলে নিজেকে মনে করতে আমার আত্মসম্মানে লাগে। চারিদিকে একটা হোটেলি আবহাওয়া—উর্দ্দি-পরা বাবুর্চির দল, সিগারেটের চোখ-জ্বালা-করা ধোঁয়া, কাপ-ডিসের অবিরত ঠুং ঠুং,—এরই মাঝে নোংরা জৈববৃত্তি চরিতার্থের মত প্রেম করার তাগিদ। এসব ভাবতেই ঘেন্না লাগে। এরকম হোটেলি প্রেমের মাঝখানে নিজেকে কল্পনা করতেও আমার গা শিরশির করে। নিজেকে বড় বেশী 'জন্তু জন্তু' মনে হয়। জন্তুরা যেমন গো-গ্রাসে গিলে উদর পূরণ করে, মানুষ তেমনি একটু টেবিলের তলায় পায়ে পায়ে ঠোকাঠুকি, কাপটা এগিয়ে দিতে গিয়ে হাতে হাত

ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে যেন গো-গ্রাসে প্রেম করার ইচ্ছেটাই চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। সুতরাং—"

তুহিন সহাস্যে ওর কথা দিয়েই আরম্ভ করে, "সুতরাং যে-কোন কলেজে প্রফেসারি তোমার একটা জুটে যাবেই, ফার্ষ্ট ক্লাস পাও বা না-পাও তার জন্যে আটকাবে না। তবে এবিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত, অতএব চল বাসে ওঠা যাক।"

"সেকি কথা,—ক্ষিদে পেয়েছে বললে, আবার আমার এক কথায় না খেয়েই বাসে উঠবে? জান তো, বাঙ্গালী মেয়ের কাছে ক্ষিদে পেয়েছে ব'লেই তাকে সবচেয়ে জব্দ করা যায়। ঐ একটি কথায় মন ভেজে না এমন বাঙ্গালী মেয়ে সত্যিই বিরল। তাই বুঝতেই পারছ, তোমার না খাওয়া হ'লে আমি কিছুতেই নড়ছি না। সুতরাং আমি লাইব্রেরীতে বসছি, তোমার হ'লে ডেকো।" তুহিনকে কিছু বলবার অবসর না দিয়েই সারা ভেতরে চলে যায়। এরপর বাসে উঠেও তারা বাড়ি যেতে পারেনি, বৌবাজারে সারার চশমার জন্যে তুহিনকেও নামতে হয়েছিল।

চোদ্দ

বৃষ্টির গান ;—সেই বৃষ্টির গান যা তুহিনও শুনেছিল বেশ কিছুদিন আগে, তা-ই আজ শুনেছে সারা, তার বিছানার বুকে জানলার গায়ে কান পেতে। শরীরটা ভাল নেই, আজ সে কলেজ যাবে না ; কিন্তু সেই চিন্তাটাই তাকে বেগ দিচ্ছে সবচেয়ে বেশী। 'না' এই ছোট্ট ধ্বনিটুকু উচ্চারণ করা হয়তো খুবই সহজ, কিন্তু এর অন্তঃস্থিত অনুরণনটাকে অস্বীকার করা বড় সহজ নয়। তাই একবার মানুষের মুখ থেকে 'না' এই শব্দটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কত 'পুঞ্জীভূত মেঘ নক্ষত্রের বেগে ধেয়ে চলে আসে'। কত প্রেমের হয় হার, কত নাটকের হয় উপসংহার। কত প্রতীক্ষার ঘনিয়ে আসে পরিশেষ —কত পরিচয়ের হয় পরিসমাপ্তি। সারাও তাই যে মুহূর্ত্তে ঠিক করেছে আজ কলেজে সে যেতে পারবে না, সেই মুহূর্ত্তেই তার উৎকণ্ঠিত প্রাণ একটা অনির্ব্বচনীয় বেদনায় উৎসিক্ত হ'য়ে উঠেছে, মনের পালক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বেদনার ভার নেমে আসছে সারা দেহে। প্রতিদিনের মত আজও ২-এ বাস তার উদর বোঝাই ক'রে কলেজ ষ্ট্রীটে ছুটে যাবে ; সে বাসে থাকবেনা শুধু লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ আর গলায় ইমিটেসান পার্লের মালা-দোলান এক মেয়ে। তা না থাকলেও কারুর কিছু এসে যাবে না—অফিসের বাবুরা ঠিক তেমনি করেই পান চিবুতে চিবুতে খবরের কাগজটা পাট ক'রে বগলে চেপে বাস ধরবেন ;

ছাত্ররা ঠিক তেমনি ক'রেই অষ্ট্রেলিয়ার খেলার কথা আলোচনা করতে করতে আড়চোখে লেডিস্ সীটের দিকে তাকাবে; বৃদ্ধ উকিল তালি-মারা চোগাচাপকান প'রে বাসের হ্যাণ্ডেল ধ'রে ঠিক তেমনি ক'রেই ঝুলতে থাকবেন; কণ্ডাক্টারও একই স্বরে চীৎকার করবে, বাসও একসময় কলেজ ষ্ট্রীটে পৌঁছে যাবে। জীবনের চল্‌তি মুহূর্ত্তগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এইসব ভাবতে ভারি অদ্ভুত লাগে। মানুষ তার সারা জীবন এইসব চল্‌তি মুহূর্ত্তগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। যেদিন তাল কেটে যায়, সুর থেমে যায়, সেদিন সে ম'রে যায়; মুহূর্ত্তগুলো কিন্তু থামে না, তারা চলতেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে ঐসব চলন্ত লহমাগুলোর পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার সুযোগ মানুষ পায়। তখন সে নিজে থেমে থাকে, তাই চারিপাশের চলন্ত জগৎটাকে দেখতে তার বেশ অদ্ভুত লাগে, তার সঙ্গে একটু দুঃখও মিশে থাকে। সে দুঃখ নিঃসঙ্গতার দুঃখ—সবাই চলছে, আমি থেমে আছি; কেউ একদিন কলেজ বন্ধ রেখে আমার পাশে এসে বসছে না। আজ সারা কলেজের সিঁড়ি দিয়ে উঠবে না, কোন ঘরে ঢুকে লেকচার শুনবে না, কোন বাসে চেপে বাড়ি ফিরবে না। অথচ তুহিন প্রতিদিনের মত আজও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবে, প্রত্যেক ঘরে লেকচার শুনবে, আবার বাসে ক'রে বাড়িও ফিরবে। কিন্তু তবু সারা প্রতীক্ষা করে তুহিনের জন্যে, আশা করে হয়তো একসময় সে আসবেই। কিন্তু ঘুম-ভরা ফুলের ওপর ভারী পা ফেলে মৌমাছি যেমন পালিয়ে যায় তেমনি ক'রেই সারার প্রতীক্ষারত মনের ওপর

পা ফেলে পালিয়ে গেল দুপুর আর বিকেল। বুকটা ব্যথায় ভ'রে গেছে সারার; শরীরটা শ্রান্ত, ক্লান্ত। মাথার কাছে জানলার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার সরু সরু ডালে একঝাঁক কালো পাখীর মত সন্ধ্যা নেমে আসছে লঘু পায়ে,—সারা শূন্যদৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ভাবে, তার মত একটা কথার তুবড়ি মেয়েকে কেউ কোনদিন ভালবাসবে এটা তার কোনদিনই মনে হয়নি। কিন্তু সত্যিই তাকে একদিন একজন বুক ভ'রে ভালবাসল, সেও তাতে যোগ না দিয়ে পারেনি। কিন্তু প্রেমের এই ব্যথাটা বইতে সে পারে না; সে হাসতে পারে, বকতে পারে, গাইতেও পারে, কিন্তু শুধু কাঁদতে পারে না। তাই যদিও সে প্রেমে পড়েছে তবু প্রেমের তীব্র ব্যথাটুকু সে কিছুতেই সইতে পারছে না। সে চায় নীড় বাঁধতে, শুধু প্রেমের সম্পুট মুখে নিয়ে উড়ে বেড়াতে তার বাধে। কিন্তু তুহিন এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন; এ সম্বন্ধে সে একবারও ভেবে দেখে না। এতদিন মেলামেশা ক'রে সারা তুহিনকে বেশ ভাল ক'রেই চিনেছে। এও জানে যে, ওর প্রেম যত তীব্র তার চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম; তাই একদিন না একদিন ভেঙে পড়তে বাধ্য। কিন্তু এ কথা ভাবতেও সারার বুক কাঁপে, তার মত মেয়েরও চোখে জল এসে যায়। আজও তাই বুক ঠেলে শুধু একটা কান্নার ঢেউ আসছে—সারাদিন তুহিন এলো না, হয়তো আর আসবেও না। হঠাৎ খুট্ ক'রে দরজায় একটু শব্দ হ'লো—সারা চমকে ফিরে তাকাল, প্রভাসবাবু ঢুকলেন। ধীরে ধীরে তিনি সারার মাথাটা

কোলে তুলে নিলেন, তারপর কোন কথা নেই, শুধু নীরবে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে চললেন। বাবার হাত দুটোয় যে কি আছে সারা অত লেখাপড়া শিখেও বুঝতে পারেনি, খালি তার সুমধুর স্পর্শে সব সময় একটা অদ্ভুত শান্তি পেয়েছে। সারার চোখ দুটো আপনিই বুজে আসে, তবে ঘুমে নয় শান্তিতে। মানুষের প্রাণে যখন নিবিড়ভাবে কিছু স্পর্শ ক'রে যায় তখনই তার চোখ বুজে আসে। হয়তো তখন সে এই ইঁট-কাঠ ঘেরা বাস্তব জগৎটাকে একেবারে ভুলে যেতে চায় চোখ বন্ধ ক'রে। কারণ, চোখই বাস্তব জগৎকে দেখিয়ে দেওয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

"ঘুমুলি সারা ?"—প্রভাসবাবু খুব আস্তে জিগ্যেস করেন।

"না বাবা, কিছু বলবে ?"

"আচ্ছা সারা, একটা কথা জিগ্যেস করব, রাগ করবি না তো ?"

সারা তার উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে এত অন্ধকারেও বাবার মুখখানা দেখবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "তোমার ওপর আমি কি একদিনও রাগ করেছি, বাবা! আমি জানি তোমার মত বাবা পাওয়া খুব কম মানুষের ভাগ্যেই সম্ভব—"

প্রভাসবাবু সারাকে আরও নিবিড়ভাবে আদর ক'রে বললেন, "এই, অমনি বাবার গুণগান আরম্ভ হয়েছে। তোর মুখে বাবার কথা শুনতে শুনতে কেন যে লোক পাগল হ'য়ে যায় না তা তো বুঝি না—"

"আর নিজে যখন মেয়ের সুখ্যাতি আরম্ভ কর তখন তো ঘর ছেড়ে পালাতে হয়।"

"কিন্তু আমি যা বলতে চাইছিলুম তা তো আমাকে বলতে দিলিনা সারা?"

সারার স্বরটা হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হ'য়ে যায়, সে খুব আস্তে আস্তে উত্তর দেয়, "তুমি যা বলবে আমি জানি, বাবা!"

"তুহিনের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুই সুখী হবি, সারা?"

"আমি তুহিনকে ভালবাসি, বাবা!"

"তাহ'লে তোর দিক থেকে কোনই আপত্তি নেই তো?"

"আমার দিক থেকে আপত্তি না থাকলেই তো হ'লো না, অন্যদিক থেকেও বাধা আসতে পারে। মানে, তুহিন আমাকে নাও বিয়ে করতে পারে।"

প্রভাসবাবু এবার একটু হেসে ফেলেন; আর সেই সঙ্গেই জুড়ে দেন, "আমি জানি তুহিন তোকে কতখানি ভালবাসে। সুতরাং—"

"ভালবাসা আর বিয়ে করা তুটো এক জিনিষ নয়, বাবা! তুহিন যে আমায় খুবই ভালবাসে তা আমিও জানি। কিন্তু এও জানি যে সে হয়তো বিয়ে করতে রাজি নাও হ'তে পারে।"

"তার কারণ কি? আমি তো জানি ওদের বাড়ির কারুরই অমত নেই, তবে?"

"এর কারণ আমি তোমায় বোঝাতে পারব না। শুধু এইটুকু আমার অনুরোধ যে, তুহিন নিজের থেকে কিছু না বললে এ-সম্বন্ধে তুমিও তাকে কিছু ব'লো না।"

অল্পভাষী প্রভাসবাবু আর একটিও কথা বলেন না; শুধু যাবার আগে জিগ্যেস করেন, "সর্দ্দিতে খুব কষ্ট হচ্ছে না তো, সারা?"

সারা হেসে বাবার হাতটা মুখের ওপর টেনে নিয়ে বলে, "না গো বাবা, না, আমি খু-উ-ব ভাল আছি।"

পনেরো

কলেজ যাওয়ার জন্যেই তুহিন কাঁধে তোয়ালে ফেলে চান করতে যাচ্ছিল, দাদার ডাকে থেমে গেল।—"কোথায় যাচ্ছিস তুহিন? আজ ক্লাস হবে না। আমার ঘরে আয়, তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে।" ক্লাস হবে না, এই অদ্ভুত সংবাদটি সত্যি কিনা জানবার জন্যে তুহিন খুবই তাড়াতাড়ি শিবেনবাবুর ঘরে পা দিল। কি একটা ষ্ট্রাইক উপলক্ষে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের ভীষণ ভিড়। শিবেনবাবু ঐ-পাশ দিয়ে আসছিলেন; শুনে এলেন যে আজ সব ইস্কুল-কলেজই বন্ধ; ইউনিভার্সিটিতেও ক্লাস হবে না। এ খবরটা তুহিনের কাছে খুবই সুখকর সন্দেহ নেই। কারণ, আকাশে কালো মেঘ আর এই ঠাণ্ডা জ'লো হাওয়ায়, কলের তলায় বসে এই এত সকালে চান করতে তুহিনের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। তা ছাড়া কাল সারা কলেজে

আসেনি, তার জন্যে মনটা একটু খারাপ ছিল, আজ একবার ওর বাড়ি যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ইচ্ছেটা মানুষের এমন একটা জিনিষ যা অধিকাংশ সময়েই অপূর্ণ থেকে যায়, তবু মানুষের আশার বা ইচ্ছের শেষ নেই। প্রতিবারই নতুন আশা নিয়ে মানুষ ডার্বির টিকিট কেনে, রেসের মাঠে যায়, ক্রশ-ওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌ করে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে ব্যাপারটা নেহাৎই আর্থিক। যদিও তার প্রভাব মনের ওপর একটা আছে, কিন্তু তা পুরোপুরি মানসিক নয়। অথচ তুহিনের অপূর্ণ ইচ্ছেটা মনের মাঝেই জ্বলে উঠেছিল, তাই নিভে যেতে মনের সমস্ত অন্তর্লোকটুকু আঁধারে ঢেকে গেল। শিবেনবাবু আচম্বিতে এমন একটা প্রশ্ন জিগ্যেস ক'রে বসলেন যার কাছে তুহিন নিজের থেকে কিছুতেই ধরা দিতে পারছিল না।

"হ্যাঁরে তুহিন, সারাকে বিয়ে করতে তোর কোন আপত্তি আছে ? তোর বৌদি তো বললে যে তোকে কিছু জিগ্যেস না ক'রেই বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে। কেমন, রাজি আছিস তো ?"

"আমাকে কিছু জিগ্যেস না ক'রেই যদি তোমরা বিয়ের ব্যবস্থা ক'রতে পার, তাহ'লে আমাকে বরের পিঁড়িতে না বসিয়ে আমার অজান্তে বিয়েটাও দিয়ে দিতে পার।"

"আরে ধ্যুৎ পাগলা, সেইজন্যেই তো তোকে জিগ্যেস করছি। তুই রাগছিস কেন ? তোরা সব আজকালকার ছেলে, তোদের মত না নিয়ে বিয়ে ঠিক করার মত সাধ্য কি কোন অভি-ভাবকের আছে ?"

"সেসব কথা থাক। আমি কিন্তু তোমার এ প্রশ্নের আপাততঃ কোন উত্তর দিতে পারলুম না। যদি কোনদিন উত্তর পাই তো ব'লব।"

তুহিনের এই রকম অদ্ভুত খাপছাড়া উত্তরে ধৈর্য্য ঠিক রাখা এবার শিবেনবাবুর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। তিনি বেশ একটু রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন, "সে কথাটা তাহ'লে তুই আজ প্রভাসবাবু এলেই বলিস।"

তুহিন চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, "প্রভাসবাবুকে কি তুমি এই ব্যাপারের জন্যে আসতে বলেছিলে নাকি?"

শিবেনবাবু একেবারে নিরপেক্ষভাবে উত্তর দিলেন, "আমাদের এ সম্বন্ধে মতামত জানতে চেয়ে প্রভাসবাবু এক চিঠি লিখেছিলেন, তারই উত্তরে আমি তাঁকে আজ এখানে আসতে বলেছিলুম।"

"বেশ, আমাকেই যখন উত্তর দিতে বলছ আমি দেব; তবে মুখে নয়, লিখে। সে চিঠিটা তিনি এলে তুমি তাঁর হাতে দিয়ে দিয়ো।"

তুহিন আর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা ভেজিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনের দুয়ারও আপনিই খুলে যায়। অদ্ভুত একটা পাগলা হাওয়া সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। সারাকে সে সত্যিই খুব ভালবাসে, তবে বিয়ে করতে তার বড় ভয় লাগে। একদিন স্বপ্নের মত মনে হ'য়েছিল, সারাকে বিয়ে করলে বোধ হয় সে সুখী হবে। কিন্তু না, তারপর সে স্থিরভাবে

চিন্তা ক'রে দেখেছে যে চলমানতাই যার মনের ধর্ম তাকে বেঁধে রাখলে শান্তি আসে না। অর্থাৎ প্রবহমান জলধারাকে একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে চিরদিনের জন্যে আটক ক'রলে তার মধ্যে আর নতুন স্রোতের চাঞ্চল্য থাকে না, সব স্তিমিত হ'য়ে আসে। প্রেমের নির্ঝরিণীকেও তাই বিয়ের সসীম পাড়ের মধ্যে বেঁধে ফেললে জীবনের স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে যায়—প্রেমটা ঘোলাটে হ'য়ে ওঠে। প্রেমের পেলব কুসুম তখন প্রয়োজনের তাগিদে পরিণত ফলের কঠিন আকার ধারণ করে। স্বামী তখন স্ত্রীর দেহটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, স্ত্রী তখন ভাত কাপড়ের স্থূল চাহিদা মেটাবার জন্যে দাবী জানায়। অর্থাৎ, শুধু ফুল ফোটাবে বলে যে শাখাটা একদিন সবুজ পাতায় ভ'রে গিয়েছিল তারই শুকনো ডাল ভেঙে রান্না চড়াবার ব্যবস্থা।

তুহিন কিন্তু তা চায় না। সে চায় তার আর সারার প্রেম চিরদিনের পূর্ব্বরাগ দিয়ে যেন ঘেরা থাকে। কিন্তু তা যখন হয় না, তখন তাদের প্রেমেরও যতি পড়ুক এইখানেই। কথাটা ভাবতেই চোখের সামনের জগৎটা ঝাপসা হ'য়ে গেল—ঠিক তেমনি ঝাপসা, যেমন লাগছে কাঁচের জানলার বাইরে ঐ বৃষ্টিভরা আবছা গাছপালাগুলোকে। সার্সির গা বেয়ে রাশি রাশি সাদা যুঁইয়ের মত অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে; এক একটা বড় বড় ফোঁটা জানলার কাঁচে এসে লাগছে আর নতুন নতুন কার্টুন ছবির নক্সা হ'য়ে ঝরে পড়ছে। তারি মাঝে একটা মুখ বার ক'রে ভেসে উঠছে, আবার বৃষ্টির ফোঁটায় ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। মুখটা বড্ড চেনা; মাথার দু'পাশে বোধহয় সেই

আলগা-হওয়া বেণী দুটিও আছে, আর সেই লাল ব্লাউজের আভাটুকুও বুঝি মিলিয়ে যায়নি।

সারাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করছে, কিন্তু আর উপায় নেই। আজই সে প্রভাসবাবুকে চিঠি লিখবে। কিন্তু সেই থেকে একটা লাইনও সে লিখতে পারছে না; সব চিন্তাগুলো বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে আসছে,—অথচ এবার তাকে লিখতেই হবে। তুহিন ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর ছড়ান ফুলস্কেপ কাগজের একখানা টেনে নেয়। তার থেকে ভাঁজ ক'রে দুটো ভাগ করে; একটা ছোট, একটা বড়। প্রথমটার ওপর সারার, দ্বিতীয়টার ওপর প্রভাসবাবুর নাম লেখে —সারার নামটা লেখে ব'ললে যেন ঠিক বলা হয় না, নামটা আঁকে। বার বার কলমের অতি অল্প আঁচড়ে নামটি সত্যিই একটা রূপ পায়। কিন্তু তুহিনের মন সায় দেয় না, আরও সুন্দর করতে থাকে। এ যেন গ্রীনরুমে বসে সুন্দরীর ভ্রূ আঁকা— সব সাজ হ'য়ে যায় ভ্রূ আঁকার আর শেষ হয় না। কিন্তু এক-সময় শেষ করতেই হয়, তা না হ'লে থিয়েটার চলে না। তুহিনেরও তাই অন্তহীন নাম লেখার প্রচেষ্টা অন্তর্লীন চিন্তা-ধারার মাঝে হারিয়ে যায়। সে চিঠি লেখে ঃ

শ্রদ্ধেয় প্রভাসবাবু,

বিয়ের কথাটা ভেবে দেখিনি বললে সত্যের অপলাপ হয় —বরং ভেবেছি যত, ভাবনাটাকে এড়িয়ে গেছি তার চেয়ে বেশী। এতদিন ডানা-ভারী মৌমাছির মত ফুলের পাপড়ির

ওপর মধু খেয়ে বেড়িয়েছি, তাই মধুর কলসীতে পা জড়িয়ে ফেলতে ভয় হচ্ছে।

সারাকে আপন ক'রে পাওয়াটা মস্তবড় সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সৌভাগ্যটা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তবেই আনন্দের সম্পূর্ণতা আসে। তার অবসর পাই নি, মনের কাছেও কোন উত্তর পাই নি—পেলে জানাব। ইতি

প্রঃ তুহিন

দ্বিতীয় ক্ষুদ্র পত্রটা তুহিন লিখল সারাকে—গদ্যে নয়, কবিতায়। নিজের অজান্তেই সে কবিতার ভাষায় কেমন একটা বিদায়ের সুর রয়ে গেল। যেন সারার কাছ থেকে সে চলে যাচ্ছে অনেক, অনেক দূরে। কবে কোথায় দেখা হবে তার কোনই ঠিকানা নেই। সারার হাসি আর রাশি রাশি কথার মালা, তাই হোক তুহিনের জীবনের পরম সঞ্চয়। ছোট ছোট ঝাপসা হ'য়ে আসা স্মৃতিতে প্রেমের অপূর্ণ দিনগুলো সার্থক হ'য়ে থাক। কারণ, আমাদের কবিই বলেছেন, 'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই।' তুহিনের কবিতাটি পঙ্‌ক্তিতে সাজালে এই রকম দাঁড়ায়ঃ

যদি কোনদিন সৃষ্টির প্রাঙ্গণ-তলে
দেখা হয়,
কর্ম্মব্যস্ত জীবনের ক'রো জয়গান,
চোখের কোনায়
জমিয়ে রেখনা কোন অশ্রুর সাগর।

শুধু ম্লান হাসি
রাতের প্রহর শেষে তারাদের মত
বর্ণহীন বাসি—
তাই তব হৃদয়ের সবটুকু বাণী
খুলে দিক,—
ব্যথার বাতাসে যদি নিভে যায়
যাক্
উৎসবের নাচঘরে জ্বলে-ওঠা প্রেমের প্রদীপ।
আঁধার অপার—
তাই দিয়ে ভরে যাক্ পাত্রখানি কানায় কানায়
তোমার আমার
কান্না-হাসির মাঝে গড়ে-ওঠা
যত অধিকার
একাকার হ'য়ে যাক্ কালের জোয়ারে
শেষ কথা, শেষ হাসি, শেষ অভিসার।

—তুহিন

ষোল

তুহিন যেদিন কলেজে গেল না,—দাদার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মেতে রইল, সারাকে কিন্তু সেদিন কলেজ যেতেই হ'য়েছিল তবে ক্লাস করার আগ্রহে নয়, তুহিনের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে। সর্দ্দিতে মাথা ভার, গায়ে হয়তো অল্প জ্বরও ছিল। কিন্তু তবু সারা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে 'দুইয়ের-এ' বাসটা থামিয়েছিল, তারপর যথা সময়ে ইউনিভারসিটির সামনে নেমেও পড়েছিল ; তবে তুহিনের দেখা পায়নি। ফেরবার সময় ভীষণ বৃষ্টি—সারার গায়ের সঙ্গে কালো লিনেনের ব্লাউজটা একেবারে সেঁটে গিয়েছে, চুল দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে। শাড়িটা ভাল ক'রে বুকের কাছটায় জড়িয়ে যখন সে ফিরতি বাসে উঠল তখন সত্যিই তার কাঁপুনি ধরেছে, জ্বরটাও বুঝি পেয়ে বসেছে—মাথাটা টলছে। এই সময়টায় বালিসে মাথা রাখলে যেমন আরাম হয়, বাসের জানলায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথা রাখতে সারার ঠিক তেমনি আরাম হ'লো। সে যেন হাওয়ার বালিসে মাথা রেখেছে—ভারি নরম, ভারি আরামের।

বাড়িতে এসে কোনরকমে শাড়িটা-জামাটা ছেড়ে যখন সে বিছানায় এসে শুয়েছে তখনও প্রভাসবাবু ফেরেননি, অথচ জ্বরটা যে বেশ বেড়ে গেছে তা সারা নিজেই বুঝতে পারছে। অদূরে জানলাটা খোলা। বাইরে বৃষ্টির ছাট এসে বিছানার

একপাশটা ভিজিয়ে দিচ্ছে, উঠে জানলাটা বন্ধ করার ক্ষমতাও সারার নেই। কবে বর্ষার সময় পেরিয়ে গেছে, প্রায় পূজোর ছুটি এসে গেল, তবু বর্ষা বাধা মানছে না। জ্বালা-ভরা চোখ-দুটো খুলে সারা সেই দিকেই তাকিয়ে আছে।—ফুটপাথের ফাটলের মধ্যে দিয়ে সবুজ কচি ঘাস বেরিয়েছে, তার ওপর ছোট ছোট হলুদ রঙের ঘাসফুল—বৃষ্টিতে অবিশ্রান্ত কাঁপছে। সারার বুকটাও ঐ রকম হলুদ ঘাসফুলের মত অবিরাম দুলছে। তুহিনের জন্যে সারার মনের নিভৃত লোকের দুর্ব্বলতাটুকু প্রভাসবাবু তাঁর স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় দিয়ে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সারার কোন বাধা নিষেধ না মেনে তিনি আজ তুহিনদের বাড়ি গিয়ে তার দাদার কাছ থেকে স্পষ্ট অভিমত নিয়ে ফিরবেন ব'লে বেরিয়েছিলেন।

কিন্তু অভিমত যে কি হবে, তা সারার বেশ ভাল রকমই জানা ছিল। তবু একটু ক্ষীণ আশা ছিল তুহিন হয়তো রাজি হ'য়ে যেতেও পারে। কিন্তু এখন অবধি প্রভাসবাবু এলেন না; বাইরে বৃষ্টি, হয়তো ভিজে গেছেন—বাবার জন্যে হঠাৎ এত মন কেমন করে সারার, ছোট মেয়ের মত কান্না পায়। বাবাকে না জানিয়ে, কিছু না খেয়েই সে আজ কলেজ গিয়েছিল। এত বেলা হ'য়ে গেল এখনও কিচ্ছু খায়নি, অথচ গরম দুধ বা চা খেতে পারলে কাঁপুনিটা একটু কমত। কিন্তু ক্লান্তিতে চাকরটাকে ডাকতেও আর ইচ্ছে করে না। বাইরে ঘাসফুল কাঁপছে, বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে; সারার মন দুলছে, চোখে নামছে ঘুম। একসময় সারা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙল প্রভাসবাবুর

চেঁচামেচিতে। সারার ঘরের জানলা বন্ধ করা হয়নি—সারার জ্বর বেড়েছে—সারা কিছু খায়নি—সারা বাইরে বেরিয়ে ভিজেছে,—এইরকম কত তত্ত্ব তিনি তিন মিনিটে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন, আর তাই নিয়ে ওঁর মত শান্ত লোকও এত হৈ-চৈ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন যে সারার নিজেরই লজ্জা করছে। সারা বেশ বুঝতে পেরেছে এবার তার পালা, তাই সে প্রস্তুত হ'য়েই শুয়ে আছে; বাবা ঢুকলেই একটা কিছু নতুন কথা ব'লে ভুলিয়ে দেবে। প্রভাসবাবু রাগলে ঐ একটা সুবিধে—অন্য একটা কথা তুললেই ভুলে যান। তারপর সারা যখন প্রচণ্ড হাসতে থাকে তখন তিনি বুঝতে পারেন, "ও! আমাকে অন্য কথা ব'লে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি আজকাল বড্ড দুষ্টু হয়েছ, সারা।"

আজও সেই ফন্দি নিয়েই সারা চুপচাপ শুয়েছিল। প্রভাস-বাবু ঘরে ঢুকতেই সুরু করে দিল, "বাবা, তোমাকে কতদিন থেকে বলছি আমার ওয়াটারপ্রুফ্‌টা এনে দিয়ো; আনছ না, আর আজ আমি এত ভিজে গেছি!" প্রভাসবাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "দেখ সারা, তুমি যেমন কোন কথাই শোন না, রোজ বৃষ্টিতে ভেজ আর জ্বর কর—আমিও এবার থেকে ঠিক করেছি তোমার কোন কথাই রাখব না। ছেলেরা বাড়িতে প'ড়তে এলে আমিও বেলা একটা অবধি পড়াব, তখন খেতে ডাকলে উঠব না। বাইরে বেরুবার সময় আমার যা ইচ্ছে ছেঁড়া-ময়লা প'রেই বেরুব, তখন যদি বল 'বাবা লক্ষ্মীটি, আমি যে শার্টটা বার

ক'রে দিয়েছি সেইটে পর'—আমি কানেও শুনব না। তাছাড়া তুমি—"

প্রভাসবাবুকে শেষ করতে না দিয়েই সারা কাঁদো কাঁদো মুখ ক'রে বলে, "বাবার সঙ্গে দেখা হ'লেই খালি বকুনি আর বকুনি। আমি কি করেছি বাবা, খালি তো একটু বাইরে গেছি,—তার জন্যে রাতদিন আমাকে ব'কবে!" সারার করুণ স্বর আর এই অল্প কয়েকটি কথাই প্রভাসবাবুর রাগ জল ক'রে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সারার মাথার কাছে ব'সে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রভাসবাবু আদরের সুরে বললেন, "আচ্ছা সারা, তুই কি এখনও সেই ছোট্টটির মতই থাকবি? তুই না এম. এ. পড়ছিস—এখনও ঠিক তেমনি অবাধ্য হবি?"

"সেইজন্যেই তো অবাধ্য হ'তে ইচ্ছে করে, বাবা! বড় হ'লে কেউ আর বকে না, আদর করে না। তাই মাঝে মাঝে ভীষণ অবাধ্য হ'তে ইচ্ছে করে।"

"বেশ বেশ অবাধ্য পরে যত পার হ'য়ো। এখন গরম দুধ-টোষ্ট সব আনতে বলছি, লক্ষ্মী মেয়ের মত খেয়ে নিয়ো।" সারা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বাবার হাতটা টেনে নিজের গালে ঠেকিয়ে আদর ক'রে ছেড়ে দিল। প্রভাসবাবু নিজে সারার মাথাটা বাঁ-হাত দিয়ে তুলে বুকের কাছে হেলিয়ে ডান-হাতে দুধের কাপ ধ'রে তাকে দুধ খাইয়ে দিলেন। তারপর একসময় সারাকে কিছু না ব'লেই বাইরে গিয়ে এক ডাক্তারকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। বাবার সঙ্গে ডাক্তারকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সারা রাগত চোখে একবার প্রভাসবাবুর দিকে তাকাল। কিন্তু

বাইরের লোকের সামনে একান্তই কিছু বলতে পারবে না ব'লে চুপ ক'রে রইল। বৃদ্ধ ডাক্তার ভাল ক'রে পরীক্ষা করার পর যখন ওষুধ লিখতে যাচ্ছেন তখন সারা একেবারে হঠাৎ ব'লে উঠল, "দেখুন ডাক্তারবাবু, আমার কিচ্ছু হয়নি, বাবা শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছেন। ওষুধ-বিষুধ তো কিছুই খেতে হবে না, না?"

"বাপ-মা যে শুধু শুধু ভয় পায় না, এ কথা তুমি এখন বুঝবে না, মা। তবে ওষুধ তো তোমাকে খেতেই হবে, তাছাড়া ভয় হ'চ্ছে ইন্‌জেকশান না দিতে হয়।"

বৃদ্ধ ডাক্তারের এ ভয়টা যে একেবারেই মিথ্যে নয় তা জানতে পারা গেল আরও দু'চার দিন পরে, যখন দেখা গেল ভীষণ নিউমোনিয়ায় সারা প্রায় সমস্ত দিনই অজ্ঞান হ'য়ে থাকছে। এদিকে প্রভাসবাবুও নাওয়া-খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েই রাত-দিন মেয়ের মাথার কাছে ব'সে আছেন। মাঝে মাঝে যখন সারার জ্ঞান হয় তখন অনেক রাগারাগি ক'রে সে বাবাকে খেতে পাঠায়। কিন্তু অত জ্বরের মাঝেও সে একটা আশা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছে না,—সে হ'লো তুহিনকে একবার দেখতে পাওয়ার। এখন মাঝে মাঝে সারার কেমন যেন মনে হয় সে হয়তো আর বাঁচবে না, সঙ্গে সঙ্গে তুহিনকে দেখার জন্যে মনটা বড় ছটফট করে। প্রভাস-বাবুকে লেখা তুহিনের চিঠিটা আর তাকে লেখা কবিতাটা দুটোই সারা পড়েছে। কিন্তু তবু সে জানে, তুহিন ঠিক আসবেই।

একদিন বহুক্ষণ জ্বরে অজ্ঞান হয়ে থাকার পর হঠাৎ যখন সারার জ্ঞান হ'লো তখন দিনের আলো প্রায় নিভে এসেছে, সমস্ত ঘরখানায় আবছা ছায়াভরা অন্ধকার। বিছানার গায়েই জানলাটার পাশে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে প্রভাসবাবু ব'সে আছেন, শাদা আকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তাঁর আঁধারের রঙে গড়া ছায়ার মত মূর্ত্তিটাকে কোন পাকা ক্যামেরাম্যানের তোলা 'সিল্যুয়েট্' ছবির মত দেখাচ্ছে। সারার শাড়ি আর চাদরের ভাঁজে ভাঁজে লক্ষ লক্ষ কালো পিঁপড়ের মত অন্ধকার এসে বাসা বেঁধেছে হাল্‌কা পায়ে। শরতের একটু শীতশীতে হাওয়া বইতে সুরু করেছে ; তাতে শরতের একটা নিজস্ব গন্ধ—সে গন্ধ জীবনের বহু বিগত শরতের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। বহুদিন আগের দেখা কোন সিনেমার গান শুনতে শুনতে যেমন সেই ছবিটার প্রত্যেকটি কান্নাহাসি-ভরা ঘটনা মনে পড়তে থাকে—ঠিক তেমনি। কোন একটা বিশেষ ঋতুর হাওয়া বইলে ঐ ঋতুর সঙ্গে বিজড়িত কত শত চেনামুখের ছবি মনের জানলায় ভিড় ক'রে আসে ; অতীতের জন্যে মনটা তখন অদ্ভুত আনচান করতে থাকে—সারার মনেও সেইরকম একটা ব্যাকুলতা। বাইরে ম্লান শাদাটে আকাশটার দিকে চেয়ে সারার কি খেয়াল হ'লো, হঠাৎ একটুকরো কাগজের ওপর তুহিনকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখে ফেললে :

তুহিন,

তোমার বইগুলো অনেকদিন থেকে এখানে পড়ে আছে। সুবিধে হ'লে একদিন এসে নিয়ে যেয়ো। তবে

তাড়াতাড়ি হ'লেই ভাল হয়; কারণ, আমার জ্বরের গতিবিধি হয়তো শুভ নয়,—পরে দেখা নাও হ'তে পারে।

ইতি

'সারা'

সতেরো

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবীটাকে কত ছোট মনে হয়; তারই মধ্যে আবার ছোট ছোট ভাগ ক'রে দেশ, মহাদেশ, সহর, গ্রাম সব গ'ড়ে উঠেছে—তেমনি একটি সহর হ'লো ক'লকাতা। সুতরাং ক'লকাতাটা যে কত ছোট তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এত ছোট ক'লকাতা সহর, তবু সারার সঙ্গে দেখা হয় না। তিনচার দিন কলেজে গিয়ে একদিনও তুহিন সারার দেখা পায়নি। সারা যে তার কি ছিল তা এখন সে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছে। কোন প্রফেসারের কোন লেকচারই তার কানে ঢোকে না, লাষ্ট বেঞ্চে বসে বসে শুধু কি সব আবোলতাবোল ছবি আঁকে; কার যেন নাম লেখে, আর ছেলেদের কারুর চোখে পড়বার আগেই কেটে দেয়।

একদিন একটা ক্লাসে ইচ্ছে করেই না গিয়ে তুহিন গেটের বাইরে বাস-ষ্টপটার দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিনকার সেই ভিখিরীর ছেলেটা এসে নীরবে তুহিনের সামনে হাত পাতল। আজ কাছে সারা নেই যে তাকে দেখিয়ে দিয়ে তুহিন একটু মজা করবে। কোন কথা না ব'লে একেবারে

অন্যদিকে চেয়ে অতিরিক্ত আনমনাভাবে তুহিন পকেট থেকে একটা আধুলি বের ক'রে ছেলেটির হাতে দিয়ে দেয়। ছেলেটি ভাবল, বাবু বোধহয় ভুলে এত পয়সা দিয়ে ফেলেছেন, "বাবু, আমাকে ভুলে আপনি এত পয়সা দিয়ে দিলেন! কেউ আমাকে এত পয়সা দেয় না, শুধু সেই দিদি, যে আপনার ব্যাগ চুরি ক'রে রাখে—" ছেলেটি আর কিছু বলবার আগেই তুহিন তার হাত থেকে আট আনাটা তুলে নিয়ে একটি টাকা রেখে দেয়। ছেলেটি অভিভূতের মত তুহিনের হাত দুটো চেপে ধরে, ব্যাকুল ভাবে জিগ্যেস করে, "আপনাকে সেই দিদি বুঝি সব টাকা দিয়েছে, বাবু? সে দিদি বুঝি আর আসবে না? বলুন না বাবু, সে দিদি কোন্ বাড়িতে থাকে"—ছেলেটি এইরকম অজস্র প্রশ্ন ক'রতে থাকে। তুহিন একটারও উত্তর দিতে পারে না, শুধু শেষকালে 'হ্যাঁ-না'র মাঝামাঝি একটা উত্তর দিয়ে এক চল্‌তি বাসে উঠে পড়ে—অন্য কোন ক্লাস করা আর হ'য়ে ওঠে না। বাড়ি আসতেই ছোট্ট একটা খাম হাতে পায়, ভেতরে চিঠিটা আরও ছোট—লেখাটা বড্ড চেনা।

'জ্বরের গতিবিধি শুভ নয়, পরে দেখা নাও হ'তে পারে': যে ষ্টোভটা আগে থেকেই বিগড়ে ছিল, কয়েকটা কথার আগুনেই সেটা বার্‌স্ট্ ক'রল। তুহিনের সমস্ত মাথায় যেন আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল। সারার অসুখ করেছে, সে বাঁচবে না—এ কখনই হ'তে পারে না। সারার অসুখ ক'রতেই পারে না,—তাকে যে তুহিন ভালবাসে। সে নিশ্চয়ই ভাল আছে। হঠাৎ যেন তুহিনের মনে হ'লো সারার অসুখের জন্যে সেই দায়ী। সে কেন সারাকে

বিয়ে করতে চায়নি ? সে নিজেই কি সারার মত মেয়ের যোগ্য ? সারা নিজে কোনদিন তুহিনকে বিয়ের কথা বলেনি ; অবাঞ্ছিত, অনাহূত হয়ে সে কারুর জীবনে আসতে চায় নি, বরং নীরবে দূরে স'রে গেছে। কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সারার, কি সুন্দর তার মন !—কি অদ্ভুত সে নিজে, অত কথা বলতে ভালবাসে অথচ নিজের সম্বন্ধে কোনদিন এতটুকু বলেনি। সেই সারা—বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—রক্তিম আঁচলে ঘেরা উচ্ছল—তার অসুখ, আর তুহিন নির্ব্বিকার ! উঃ অসহ্য, আজই সে যদি সারাকে বিয়ে করতে পারত তাহ'লে বোধহয় একটু শান্তি পেত। মনের উত্তেজনায় তুহিন টেবিলের বই-খাতা সব মেজেতে ছড়িয়ে টেবিল-ক্লথের তলা থেকে সারার একটা ফটো বার করলে,—সেটা সারাকে লুকিয়ে তুহিনই একসময় ষ্টিমার পার্টিতে তুলেছিল। ছবিটা দেখতে দেখতে এক সময় মেজেতে স্তূপাকার করা বইয়ের মধ্যে গুঁজে তুহিন একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দরজার কাছে মুখোমুখি বৌদির সঙ্গে দেখা। বৌদি কিছু বলবার আগেই তুহিন ঝড়ের মত ব'লে চ'লে যায়, "দাদাকে ব'লো সারাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করব না। সারার অসুখ যদি সারে তাহ'লে ভাল, আর তা না হ'লে আমি সারা জীবন অবিবাহিত থাকব।"

বৌদি ঠিক ক'রে কিছু বোঝবার আগেই তুহিন রাস্তায় পৌঁছে গেছে। কলেজ থেকে ফিরল, কিছু খেল না, জামা ছাড়ল না ; এই অদ্ভুত খামখেয়ালী ছেলেটিকে নিয়ে মিনতি সত্যিই বড় দুর্ভাবনায় পড়েছেন। এখনও তাকে ঠিক

ছোটবেলার মত খিদে পেয়েছে এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। মিনতি ধীরে ধীরে তুহিনের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন, মেজেতে ছড়িয়ে পড়া বইগুলো গুছিয়ে রাখলেন টেবিলে। চোখে পড়ল সারার একখানা ছবি আর তারই লেখা লাইন চারেকের ছোট এক চিঠি। ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল মিনতির কাছে; বুঝলেন সারার অসুখ তুহিনকে পাগল ক'রে তুলেছে। তবে এও বুঝলেন এবার আর তুহিন মত পাল্টাবে না; দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে যে সঙ্কল্পে পৌঁছয়, তার থেকে সে কখনই নড়ে না। কথাটা মনে হ'তে মিনতি মনে মনে সুখীই হ'লেন; কারণ, সারাকে বৌ ক'রে ঘরে আনতে তাঁর ইচ্ছেটাই সবচেয়ে বেশী। মেয়েটিকে একদিনেই তিনি ভালবেসে ফেলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা কথা মনে হ'তেই তাঁর চোখ দুটো কর্‌কর্‌ ক'রে উঠল,—সারার অসুখ সারবে তো?

সারার অসুখের খবর শুনে তুহিন সেদিন যতখানি পাগল হ'য়ে বাড়ি থেকে রাস্তায় ছিট্‌কে পড়েছিল, ঠিক সেই অনুপাতেই সে সারা আর প্রভাসবাবুকে হাসিয়ে বিছানা থেকে ছিট্‌কে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তুহিনের এই একটা অদ্ভুত গুণ যে, অবস্থার বৈপরীত্যে মানুষ যখন স্বভাবের সহজ ভাবটাকে জোর ক'রে দাবিয়ে রাখে, সে সেই সময় সহজতার সুনিপুণ অভিনয়ে সকলকে তাক্‌ লাগিয়ে দিতে পারে। এ যেন ঠিক কোন দুর্গম, দ্রষ্টব্য স্থানে পায়ে হেঁটে পৌঁছনোর মত—চলতে চলতে সবাইকারই ক্লান্তি আসে কিন্তু কেউ 'বসব'

একথাটা মুখফুটে বলতে পারে না সঙ্গীদের বিদ্রূপের ভয়ে ;— তুহিন সে ক্ষেত্রে সোজাসুজি পথের ওপরই ব'সে পড়ে আর তার দেখাদেখি অন্য সকলেই হাসিমুখে জিরিয়ে নেবার সুযোগ পায়। সারাদের বাড়িতেও সেদিন ঠিক সেই অবস্থাই হ'য়েছিল। সারা নিজেই নিজের অসুখের ভারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তার চিরদিনের উচ্ছল প্রাণটা হঠাৎ আট্‌কা পড়ে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল, অথচ প্রভাসবাবুর কাছ থেকে এতটুকু হাসির হাওয়া পাওয়ার উপায় নেই, মেয়ের অসুখে তিনি নিজেই নাওয়া-খাওয়া ভুলতে বসেছেন। সেই আশ্চর্য্য-রকম গম্ভীর আবহাওয়ার সবটুকু গুমোট কেটে গেল তুহিনের আকস্মিক আগমনের আচম্বিত উচ্ছ্বাসে। তুহিন সরাসরি ওপরে উঠে এসে সারার একেবারে কাছটিতে বসে পড়েছিল। তারপর যে ফিডিং-কাপটা নিয়ে সারা এতক্ষণ ভাবছিল মুখে তুলে ধরার জন্যে বাবাকে ডাকবে কিনা, সেটা তুহিন নিজের হাতেই সারার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরল।

জানলার ধারে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে থাকতে প্রভাসবাবুর একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। তুহিনের মৃদু পদশব্দে যখন তিনি চমকে চোখ মেললেন, সারা তখন নীরবে চোখ বুজে গরম দুধ খাচ্ছে। সুতরাং তুহিনকেই একটা উত্তর দিতে হয়, "আমাকে না খবর দিয়ে একা-একাই মেয়ের সেবা ক'রব ভাবলে কি আর ইকনমিক্স চলে—Division of Labour-এর মত Economics-এর এত বড় একটা মডার্ণ থিয়োরি-ই যে তাহ'লে মিথ্যে হ'য়ে যায়।"

"ঠিক ধরেছ তুহিন, এতদিন ধ'রে ইকনমিক্স প'ড়েও দেখছি হৃদয়ের ব্যাপারে ওগুলোকে কিছুতেই ঠিক মত খেয়াল ক'রে কাজে লাগান যায় না—সব অর্থনীতিই হৃদয়ের কাছে একেবারে অর্থহীন।"

"সেইজন্যেই তো বলছি ঐসব অর্থহীন ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে সারাকে এবার পুরোপুরি আমার হাতে তুলে দিন—মানে, ও ভাল হ'লেই আর দেরী না ক'রে—"

সারার ততক্ষণে দুধ খাওয়া শেষ হয়েছে, সে একটা হাত দিয়ে তুহিনের মুখ চাপা দিয়ে দিয়েছে। লজ্জায় তার রোগপাণ্ডুর মুখখানা আরও একটু লাল হ'য়ে উঠলো—আরও সুন্দর লাগল তাকে দেখতে।

প্রভাসবাবু বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, "বেশ তো, তার জন্যে আর চিন্তা কি?"

ঠিক সেই মুহূর্তে তুহিনের চোখের সঙ্গে সারার চোখ এক হ'য়ে গিয়েছিল। সে চোখের ভাষায় কি ছিল জানি না, তবে সারা তুহিনের আর একটু কাছে স'রে গিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

আঠারো

বেশ কিছুদিন হ'লো পূজোর ছুটি পড়ে গেছে। প্রায় একমাসের ওপর সারা বিছানায় শুয়ে ছিল, এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হ'লেও চলাফেরার বিষয়ে পূর্ণমুক্তি পায়নি—সে ক্ষমতাও তার নেই, বড্ড দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, একটু রোগাও হয়েছে। সারা যখন তাই নিয়ে আক্ষেপ করে তখন তুহিন বলে, "রোগ হ'লে যে মানুষকে এত সুন্দর দেখায় তা এই প্রথম বুঝলুম তোমায় দেখে। আগের চেয়ে তোমাকে আরও কত যে সুন্দর লাগছে তা তুমি নিজে কিছুতেই বুঝবে না।"

সারা মনে মনে ওর পাগলামির কথা চিন্তা ক'রে হাসে ; ভাবে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই তাকে বোধহয় তুহিন এইসব অদ্ভুত কথা বলে। একদিন জিগ্যেস ক'রতে তুহিন স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলে যে, কিছুদিন রোগভোগের পর এক-একটা মেয়েকে কেন এত সুন্দর দেখায়। তার মতে জ্বরের নিজস্ব একটা রূপ আছে, অর্থাৎ ইংরিজি পরিভাষায় যাকে বলা যায় 'ন্যাচার‍্যাল গ্রেস্', সেটা কতকটা ভোরের নিভে-আসা তারার ম্লানিমার মত প্রদীপ্ত কিন্তু প্রখর নয়। জ্বরের পরে মানুষের চিরদিনের একঘেয়ে অভ্যাসমলিন মুখখানা বিষাদের স্নিগ্ধতায় ধোয়া হয়ে যায়, মিলিয়ে-যাওয়া বেদনার অস্ফুট একটা আভাস ফুটে ওঠে চোখের কালো পক্ষ্মরেখায়—চোখদুটো আরও কালো মনে হয়। মাথায় চিরুণী দেওয়া রোজকার অভ্যস্ত চুলগুলো

জ্বরের পরে রুক্ষ, অবাধ্য হ'য়ে পড়ে, তাদের অভ্যস্ততার বাঁধন-ছেঁড়া রূপটা বেশ লাগে। অর্থাৎ তুহিনের মতে অসুখের পর দেহের প্রতিটি রেখায় একটা নতুনের রঙ ফুটে ওঠে, যার মিল চিরদিনের ব্যবহারিক জীবনে নেই। এত কথার পর আর সারা এ ব্যাপারটাকে অস্বীকার করতে সাহস করে না। এইসঙ্গে আরও একটা জিনিষও সে অস্বীকার করতে পারছে না, তা হ'লো তার ঘুরে বেড়াবার সখ। অথচ ভয়ও হ'চ্ছে—প্রভাসবাবু অনেক ক'রে বারণ ক'রে বেরিয়েছেন—এখন একলা উঠতে গিয়ে প'ড়ে গেলে তিনি রাগে হয়তো কথা বলাই বন্ধ ক'রে দেবেন। অগত্যা অক্স্‌ফোর্ড বুক্ অব্ ভার্স-খানা খুলে, রোদের দিকে পিঠ রেখে বালিসে হেলান দিয়ে সারা পাতা ওল্টাতে থাকে।

শরতের দুপুর। রোদের বন্যা নীল আকাশের পাড় ভেঙে, জানলার শিক ভেঙে হুড় হুড় ক'রে ঘরে ঢুকে আসছে। সারার শাদা বিছানার ওপর, লালচে বেণীর ওপর, সোনার হারের ওপর রোদ ভেঙে পড়েছে। তার গায়ে একটা শাদা আটপৌরে ব্লাউজ, শাড়ির খোলটাও শাদা, বুকের এক দিকটায় অল্প রুক্ষ মোটা বেণীটা,—আলোর বন্যায় তাকে সত্যিই ভারী সুন্দর লাগছে। মাঝে মাঝে খোলা দরজাটা দিয়ে শীতের আমেজ দেওয়া একটা হাওয়া আসছে—বেড্-কভারটা, টেবিলক্লথের ধারগুলো সে হাওয়ায় উড়ছে, ফুলদানী থেকে বাসি গোলাপের পাপড়িগুলো ঝরে পড়ছে মেঝেতে। সারা এক একবার ভারি আনমনা হ'য়ে পড়ছে। অজস্র সোনালি

আলোর ঢেউয়ে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে—পাকা ধানের রঙ রোদের গায়ে, সারার মনে। একটা পরিপুষ্ট টিক্‌টিকি দেওয়ালে টাঙানো একখানা ছবির আড়াল থেকে মুখ বার ক'রে স্থির হ'য়ে আছে। হাওয়ায় ছবিটা মাঝে মাঝে ত্বলছে, টিক্‌টিকিটাও পোকার সন্ধানে এক আধ পা এগুচ্ছে আবার পিছিয়ে ছবির আড়ালে ঢুকে যাচ্ছে।

শরতের এইরকম শান্ত সম্পূর্ণ ত্বপুরে একা একা ব'সে থাকতে থাকতে স্বল্পতম শব্দেও মনে হয় কে যেন আসছে। কতদূর থেকে তার অস্পষ্ট পায়ের ধ্বনি আসছে ভেসে—সে শুধু চলছেই, কোথাও পৌঁছচ্ছে না। ছোট্ট অমলের নরম কল্পনার ওপর ঠুং ঠুং ঘণ্টা বাজিয়ে যেমন ক'রে ডাকহরকরা চলত অশেষ চলার পথে, ঠিক তেমনি ক'রে প্রতি মানুষের প্রাণে এক এক সময় অনাগতের অবিরত পদধ্বনি ভেসে আসে। কিন্তু সে তো গেল অনাগতের পদধ্বনি কল্পনায়, তুহিন যে আগত, তাই তার পদধ্বনি শোনা গেল দ্বারপ্রান্তে।

"আচ্ছা সারা, এমন একটা সোনালি ত্বপুরে আমার কবিতা না প'ড়ে কিনা তুমি অন্য বই পড়ছ!"

"আচ্ছা তুহিন, এমন একটা কথা-ক'য়ে-ওঠা দিনে আমাকে বাইরে না ডেকে তুমি কিনা এলে ঘরে গল্প জমাতে!"

তুহিন তাড়াতাড়ি সারার আরও কাছে সরে গিয়ে হাত জোড় ক'রে নাটুকে ভঙ্গিতে বলে, "আমি আমার অপরাধ স্বীকার ক'রে নিচ্ছি দেবি, কোথায় যেতে হবে আজ্ঞা করুন।"

সারা হাসতে হাসতে দুর্ব্বল হাতদুটো দিয়ে তুহিনের কাঁধের ওপর ভর দেয়, বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলে, "আপাততঃ ক'লকাতার সেই চিরপরিচিত যুগল-মিলনের স্থান লেক্ বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, সামনের বারান্দাটায় যেতে পারলেই সুখী হব।"

সারাকে ধ'রে আস্তে আস্তে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে তুহিন তারই পাশে একটা ছোট্ট মোড়ায় ব'সল। অনেকদিন পরে বাইরের আলোয় বেরিয়ে অকারণে সারা খুসী হ'য়ে উঠল ; উচ্ছল ভঙ্গিতে বেণীটাকে গালের চারপাশে জড়িয়ে বলল, "তুহিন, দিনটা এত ভাল লাগছে ! চল, কোথাও বেরিয়ে যাই। অন্ততঃ আজকের দিনটির জন্যেও যদি সব রোগ-জ্বালা ভুলে বেরিয়ে পড়তে পারতাম !"

"ইস্, এই সামান্য কথাটার জন্যে এত চিন্তা করছ ! আমি কিন্তু এই ব্যাপারটার জন্যে একেবারে চিন্তা করি না। যক্ষুনি বাইরে যেতে ইচ্ছে করে, বিছানায় শুয়ে-শুয়েই জানলাটা খুলে দিই। তারপর ট্রামে-বাসে লোকের ছাতার গুঁতো না খেয়ে, পকেট সামলাবার দিকে মনোযোগ না দিয়ে দিব্যি আরামে যেখানে খুসী ঘুরে বেড়াই।"

"রক্ষে করো। সেরকম ঘোরার জন্যে মনের আবার দুটো পাখার দরকার। অতি দয়া ক'রে দুটো পা দিয়েছেন বিধাতা, এই ঢের ; এ দুটোকে কাজে লাগাতে পারলেই বাঁচি। তোমার মত আর মনের পাখায় কাজ নেই।"

"ঐ তো ভুল কর, দুটো উপায়ই শিখে রাখতে হয়। সব

সময় কি আর পায়ের ওপর নির্ভর করলে চলে ? এই এখন যেমন তোমার অবস্থা। এসময় যদি ধ'রে নাও তোমার আমার কারুরই পা নেই, তুজনেই উড়ে চলেছি—দূরে, বহু-দূরে, সহরতলী ছাড়িয়ে এক ধূসর সন্ধ্যার দেশে—সেখানে একটিও চেনা পথ-ঘাট নেই, সব অচেনা। মেঘে চাপা প'ড়ে সূর্য্যের আলোটা বিবর্ণ-ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠেছে—আমরা যেন বহু শতাব্দী আগের কোন পরিত্যক্ত নগরীতে পা দিয়েছি, যেখানে একদিন ছিল আজকের দিনটির মত আলোর বন্যা, ছিল কথা আর হাসির অজস্রতা, ছিল জাগ্রত প্রাণের চাঞ্চল্য। তখনও সে নগরীতে আলো ম'রে যায়নি, কথা যায়নি ফুরিয়ে, হাসিও থামেনি। তারপর হঠাৎ একদিন ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গারে পম্পাইয়ের মত সে নগরীর কোলাহলও স্তব্ধ হ'য়ে গেল, প'ড়ে রইল সারি সারি সমাধিভূমি আর মরা আলোর সমারোহ। সেই নিভে-আসা আলোয় হেঁটে চলেছি তুমি আর আমি, সে আলোর রঙ কেমন জান ? ঠিক 'অরোরা বোরিয়ালিসের' মত। সে আলোয় খালি খালি তোমার মুখ দেখছি—"

"আমায় কেমন দেখাচ্ছিল, তুহিন! খুব সুন্দর, না ? আচ্ছা তুহিন, আমায় বিয়ে ক'রে কি তুমি সত্যিই সুখী হবে ?"

"খু-উ-ব। কিন্তু তুমি কি আমাকে একটুও কবিত্ব করতে দেবে না ঠিক করেছ ?"

"কবিত্ব করার চেয়ে কবিতা শুনতে আমার বেশী ভাল লাগে।—তোমার কবিতা একটু পড় না, তুহিন।"

"কবিতা সঙ্গে নেই, তবে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরোয়

একটা অঙ্ক করা আছে, সেটা মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি। তুমি সেটা ব'সে ব'সে মিলিয়ে দেখ, আমি ততক্ষণ বাড়ি থেকে কয়েকটা কবিতা আনি।"

উঠে বেরিয়ে যেতে যেতে তুহিন ছোট্ট একটুকরো কাগজ সারার কোলের ওপর বেণীটা চাপা দিয়ে রেখে গেল। তাতে ছিল কোন অঙ্ক নয়, কবিতাই—

ময়ূরকণ্ঠী আকাশের গায়ে
উঠেছে আলোর ঝড়—
সোনালি আলোর ধূলো উড়ে যায়
নিবিড় নিরন্তর।
দিনের মিনারে রোদের ঘূর্ণি
জীবনের গান গায়—
শুভ্র ফেনার দিন ভেসে চলে
ঝিনুকের নৌকায়।
রাশি রাশি ফেনা বয়ে আনে আজ
তুহিনের উপহার
আলো দিয়ে গড়া মুক্তোর মত
সারার রত্নহার।
ময়ূরকণ্ঠী আকাশের গায়ে
উঠেছে আলোর ঝড়—
তুহিন-সারাতে ভেসে যায় আজ
মুক্তির নির্ঝর।

উনিশ

সারা-তুহিনের বিয়ে—শাদা রোদ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকে হোয়াইটওয়াস্ করা হ'য়েছে। ছাদে বাঁধা হয়েছে নীল আকাশের চাঁদোয়া, তাতে শাদা মেঘের পাড় বসান। সোনার আলোয় ডানা ডুবিয়ে শাদা শাদা বকের দল চলেছে উড়ে, নীচে রাশি রাশি সূর্য্যমুখী আর জিরেনিয়ামের চুলে প্রজাপতির রিবন উড়ছে হাওয়ায়। পরিপূর্ণ নদীগুলো ঘেমে ঘেমে উঠছে, ঘামের ফোঁটার মত অজস্র ঢেউ পড়ছে গড়িয়ে। সারা-তুহিনের বিয়ে—পৃথিবীও আর ঠিক নিজেকে যেন ধ'রে রাখতে পারছে না, অজস্রতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুটিয়ে দিতে চায় সে নিজেকে।

শীত এসেই গেছে, এর পরেই ফাগুন। সেই ফাগুনেই বিয়ের দিন। তার জন্যে কিন্তু তুহিন বা সারা কারুর মধ্যেই কোন পরিবর্ত্তন আসেনি, অর্থাৎ পরিণয়ের গুঞ্জন তাদের মধ্যে কোন লজ্জার প্রহসন আনতে পারেনি। ওরা যেমন ছিল তেমনিই আছে, বরং কলেজে যাওয়ার সময়ও তুহিন আজকাল ধর্ম্মতলার বাস-ষ্টপে সারার জন্যে অপেক্ষা করে। বহু বাস ছেড়ে দেওয়ার জন্যে ছেলেরা একটু হাসাহাসি করে, কিন্তু সেগুলোকে তুহিন বাসেরই পুরোন টিকিটের মত মুড়ে দুমড়ে ফেলে দেয় মনের ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেট-এ। তারপর, যে বাসটায় সারা আসছে, হাজার ভিড় থাকলেও সেই বাসটাতেই তুহিন উঠে পড়ে,—

সারা বসে দরজার-গায়ে-লাগান লম্বা লেডিস্ সীটটাতে, ফলে রাস্তা থেকে সহজেই তাকে চোখে পড়ে। এ ছাড়া আজকাল তুহিন সারাকে নিয়ে মাঝে মাঝে নিউমার্কেটে ফুলের দোকানে যায়, অজস্র ফুল কিনে দুজনে বাড়ী ফেরে। ফুলের দোকানদার তুহিনকে বেশ ভাল ক'রেই চেনে—আরও চেনে তার দাদা শিবেনবাবুকে। তুহিনের ফুলগুলোও ছিল বাইরের সাজান, শুকনো ফুলগুলোর চেয়ে আলাদা আর অদ্ভুত; দার্জিলিঙের রঙিন মোমের মত গ্ল্যাডিউলাস ফুল ছিল তুহিনের প্রিয়, সেগুলো পেতও একেবারে তাজা।

একদিন বিকেলে নিউমার্কেটে সেই গ্ল্যাডিউলাস কিনতে গিয়েই রিনির সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল আচম্বিতে। সেদিন সঙ্গে সারা ছিল না, অথচ কোটের পেছন দিকটায় কার নরম হাতের স্পর্শে তুহিন চকিতে ফিরে তাকিয়েছিল, রিনি কিছু না ব'লে কালো মখমলের ওপর সোনালি জরির কাজ করা গোল ভ্যানিটিব্যাগটি খুলে একগুচ্ছ সাদা আপেলের ফুল বার ক'রে আটকে দিয়েছিল তুহিনের কোটের ফ্লাওয়ার বাটনে, ধীরে বলেছিল, "নতুন ফুলের সমারোহ এসেছে তাই তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম। যাবে তো?"

তুহিনও ছোট্ট একটা গোলাপের কুঁড়ি রিনির রক্তিম লঙকোটে পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, "লাল চিঠির বদলে লাল গোলাপে নেমন্তন্ন জানালুম, ফাগুন মাসে আমারও দিন—দাদা বোধহয় তোমার বাবাকে সব খবরই দিয়েছেন?"

রিনি সহাস্যে ঘাড় নেড়ে জানায় যে সে সব খবরই পেয়েছে।

অথচ রিনির ব্যাপারটা তুহিনের কিছুই জানা নেই, তাই তুহিন স্পষ্টভাবেই জিগ্যেস করে, "কিন্তু রিনি, তোমার রোমান্সটা তো কই বললে না ?"

"নাঃ তুহিন, তুমি দেখছি ঠিক তেমনই আছ। এই হাটের মাঝে আমি আরম্ভ করব প্রেম-কাব্য ? চল আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি।"

তুহিনকে বাধা দেওয়ার অবকাশ না দিয়েই সে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে তুলে নিল নিজের গাড়িতে, নিজে বসল ষ্টিয়ারিঙে। গাড়ির সময়টুকু সবাইকার খবর নিতেই চ'লে গেল। সেই সময়ই তুহিন জানতে পারল যে রিমি বেচারী নাকি বিয়ের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে কার্শিয়ঙের কোন একটা ইস্কুলে মাষ্টারি নিয়ে চলে গেছে, সে আসবে একেবারে রিনির বিয়ের সময়।

রিনিদের বাড়িতে দুটো মুখোমুখি চেয়ারে বসে সেদিন বেশ খানিক রাত অবধি তুহিন অনেক কথা শুনেছিল, কিন্তু বলেছিল বেশী নয়। রিনি নিজেই বললে তার প্রেমের উপাখ্যান—মাঝে মাঝে একটু হয়তো লাল হয়েছিল, কিন্তু আলো-নেভা ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকারে তা ঠিক বোঝা যায়নি।

তুহিন শিলং থেকে চলে আসার পরে একদিনের ঘটনা—রিনি গিয়েছিল তারই নিজস্ব কয়েকটি এনলার্জ করা ছবি ষ্টুডিও থেকে আনতে। দোকানে ঢুকেই একটা দৃশ্যে তার মেজাজ গেল বিগড়ে,—তারই সেই বড় বড় এনলার্জ করা ছবিগুলোর একটি নিয়ে এক ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে দেখছেন। ছবিগুলো

সুশোভনবাবুর এক ফটোগ্রাফার বন্ধু তুলেছিলেন। রিনিকে দেখতে কোনকালেই অসুন্দর নয়, ছবিতে তার মুখটা আরও সুন্দর লাগছিল। সেই জন্যেই বোধ হয় সে ছবিগুলো বড় করতে দিয়েছিল; কারণ, ছবি ভাল হ'লেও বড় না ক'রে রেখে দিতে একমাত্র তুহিন ছাড়া আর কেউ বোধহয় চায় না। তুহিন বলে মানুষের ছবি বড় ক'রে দেওয়ালে টাঙিয়ে টাঙিয়ে ঘরটাকে যাদুঘর বানাতে ওর ভাল লাগে না। অর্থাৎ ও বলতে চায়, একটিমাত্র মুহূর্ত্তকে ঐভাবে ফ্রেমে আটকে রাখলে নাকি জ্যান্ত মানুষকেও মরা মনে হয়। সে মানুষ তখন ফটোর হাসি হাসে। সে হাসি কখনও মেলায় না; ফটোর স্থির দৃষ্টি নিয়েই চেয়ে থাকে—সে চোখের পাতা পড়ে না; যে হাতটা নিয়ে খোঁপায় কাঁটা গোঁজার pose করেছিল, সে হাতটা আর নামে না। এক কথায় বললে, ফটোর সেই objectটি মৃতের সমস্ত গুণ সঞ্চয় ক'রে হাওয়ায় মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হ'তে থাকেন ফ্রেমসমেত। সে যাই হোক্, তুহিনের এইসব মতামতে রিনির কিছুই এসে যায় না, সে নিজের সেই ফটোর চিরপরিচিত আধ-আধ হাসিভরা মুখখানা বড় ক'রে ঘরে টাঙাবেই। কিন্তু তাই ব'লে অন্য একজন অপরিচিত লোক যে দোকানে ব'সে ব'সেই তার ছবিটি উপভোগ করবে, এ তার কাছে অসহ্য। তাই বেশ রাগতভাবেই রিমি সরাসরি শুধিয়েছিল, "দেখুন, ছবিটি কোন সিনেমা এ্যাক্‌ট্রেসের নয়—আমারই, সুতরাং ওটা অন্য পাঁচজনে দৃষ্টি দিয়ে গিলবে এ আমি চাই না।" ভদ্রলোক এই হঠাৎ আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না; তাই

ফরসা মুখটা রাঙা হ'য়ে গেল, কানটা গরম হ'লো, তবু মুখ দিয়ে প্রথমটায় কোন কথা বেরুল না। শেষে তাড়াতাড়ি ক'রে ছবি ক'টা খামে ভ'রে অতি বিনীতভাবে মাপ চেয়ে বাইরের বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রেই তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু অস্বাভাবিক রকম বড় বড় চোখদুটো তুলে একবার শুধু প্রথমটায় রিনিকে দেখেছিলেন, তারপর সেই যে চোখ নামিয়েছিলেন রাস্তায় পা দেওয়ার আগে সে চোখ আর তোলেননি।

এদিকে ভদ্রলোকের সকরুণ অবস্থায় রিনির যে একটু দুঃখ হ'য়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না ; তবে তার হাসিও পেল যখন সে নিজের ছবিগুলো মিলিয়ে দেখতে লাগল। ভদ্রলোক লজ্জায় ভয়ে অভিভূত হ'য়ে নিজেরই কয়েকখানা ছোট ছোট প্রিণ্ট রিনির ফটোর সঙ্গে মিশিয়ে ভুলে চ'লে গেছেন। রিনি ভাবল, এখুনি গাড়িটা নিয়ে একটু এগিয়ে গেলে ভদ্রলোককে হয়তো ধরা যাবে, আর এত গালমন্দের পরে বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারলেও মন্দ হয় না। ভদ্রলোক প্রায় ছুটেই রাস্তা দিয়ে চলেছিলেন, হঠাৎ একটা গাড়ি এসে পাশে থামতে আর সেই গাড়ির জানলায় রিনির মুখ দেখে তিনি ভীত-হস্তদন্ত হ'য়ে পকেট হাতড়ে উত্তর দিলেন, "বিশ্বাস করুন, আমি আর আপনার একটিও ছবি আনিনি—"

ভদ্রলোক একবারও মুখ তুলে তাকালেন না, ছিমছিমে বৃষ্টিতে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। রিনি গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে ভদ্রলোককে বললেন, "সে পরে হবে, আপনি আগে গাড়িতে উঠুন তো।"

তারপরের ঘটনা নেহাৎই মামুলি। লাজুক ভদ্রলোকের লজ্জাও কাটল, মুখে কথাও ফুটল, বড় বড় চোখ দুটো তুলে কারণে-অকারণে রিনির দিকে তাকাতেও ভয় হ'লো না। এরপর একদিন দুজনেই স্বীকার ক'রে নিলে যে প্রেম জিনিষটা নেহাৎই দুর্ব্বার-দুরন্ত, তাকে বাঁধতে গেলে শক্ত গাঁটছড়ার প্রয়োজন।

সেদিনটা ছিল এপ্রিলের এক উজ্জ্বল প্রভাত। শিলং লেকের পাড়ে অজস্র 'ফর্‌গেট্‌-মি-নট্‌' ফুলের পাপড়িতে শিশিরের সুড়সুড়ি—হাওয়ার হাতের স্পর্শ। লেকের জলে সোনালি রোদের ভস্ম ছড়ান, চারিদিকের মরস্থমী ফুলগুলোও তার মধ্যে পাপড়ি ডুবিয়ে নিশ্চিন্তে চোখ মেলে আছে—গ্রাম্য-তরুণী যেমন পরপুরুষের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নিরাবরণ দেহের তনিমা লুকিয়ে রাখে একগলা জলে।

রিনির বঁধু সেদিন তার খোঁপায় একগুচ্ছ ফুল গুঁজে দিতে দিতে ফুলটারই নাম উচ্চারণ করেছিল, রিনিও ওর কোটে ফুল গুঁজে দিতে দিতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেছিল 'ফর্‌গেট্‌-মি-নট্‌'

আজকে কিন্তু রিনির সেই প্রেমগাথা শেষ হওয়ার আগেই তুহিন বলেছিল, "ছেলেটির নাম নিশ্চয়ই সৌমেন?" রিনিও বিস্ময়ের আবেগে জিগ্যেস ক'রেছিল, "তুমি কি ক'রে জানলে?"

"অত লজ্জা আর অত টানা টানা বড় বড় চোখ একমাত্র সৌমেনেরই আছে ব'লে জানি—"

পরে জানা গিয়েছিল ছেলেটি তুহিনের সঙ্গে ইস্কুলে অনেক দিন এক সঙ্গে প'ড়েছে।

* * *

এর পরে আর আমার বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। কারণ, তুহিন বলেছিল বিয়ের খবরটা সবাইকে দিতে, কিন্তু তার বেশী নয়—তাহলেই আবার নিমন্ত্রণ ক'রতে হবে। তাই আমি আর তুহিন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, তবে লোকে বলে বিয়ের রাতে তুহিন নাকি সব অদ্ভুত অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কাজ করেছিল। দুপুর থেকে সারাদের বাড়ি পালিয়ে গিয়ে বসে ছিল, পাছে বরের সাজান গাড়ি চেপে বিয়ে ক'রতে আসতে হয়; কিছুতেই চন্দন পরতে চায়নি, শেষে সারা জোর ক'রে নিজে হাতে চন্দন পরিয়ে দিয়েছিল—এই রকম আরও কত কি। তাছাড়া সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটেছিল রাত্তির বেলায়। মাথায় বেলের গ'ড়ে দেওয়া, মুখে লবঙ্গ দিয়ে শ্বেতচন্দন পরান সারার কনে-কনে মুখখানা সত্যিই অপূর্ব্ব লাগছিল। সেই মুখখানার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তুহিনের ইচ্ছে হ'লো সারাকে আগের মত একটু রাগিয়ে দিতে। তাই সারা যেই জিগ্যেস করল, "কি দেখছ অমন ক'রে?" সঙ্গে সঙ্গে তুহিন উত্তর দিল, "দেখছি তোমায় আজ মোটেই মানায়নি। বিশ্রী লাগছে।" প্রত্যেক মেয়ের মত এ কথাটায় সারারও প্রথমটায় একটু রাগ হ'য়েছিল, কিন্তু তুহিনের মুখের দিকে চেয়েই সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল আর উত্তর দিল, "ঠিক বলেছ, আমি এত সুন্দর যে তোমার পাশে একটুও মানাচ্ছে না—বিশ্রী লাগছে। তবে চিন্তা ক'রো না। আমি তো তোমার বউ, তাই এ কথা আর কাউকে বলছি না।"

তুহিন হাসতে হাসতে সারাকে কাছে টেনে নিয়ে জিগ্যেস করে, "তুমি আমার কে, আর একবার বলো না, সারা!"

সারা তুহিনের বুকের ওপর থেকে আবছা ক'রে বলেছিল, "আমি তোমার বউ।"

এরপর সারা চোখ বন্ধ করেছিল।